মুকুল

চৈত্র
১৩৪৮ সাল

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
২৯৪ দর্গারোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা
বার্ষিক ২৲ টাকা

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা"

[১৬শ বর্ষ] নব পর্য্যায় চৈত্র ১৩৪৮ [১২শ সংখ্যা

তোমাদের ভালবাসি

শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী

ছোট ছোট ভাইবোনে বড় ভালবাসি,
ভালবাসি তোমাদের সুন্দর হাসি।
ভালবাসি উৎসুক নয়নের আলো
নিষ্প্রভ চোখে মোর কত লাগে ভাল।
আধফোটা জীবনের সুন্দর শতদল
তোমাদের মাঝারে সতেজ ও নিরমল।
হাসি, গান, কলহের ঝরণার উচ্ছ্বাস,
মহুয়ায় মিশে যাওয়া বাতাসের নিঃশ্বাস,
মোর প্রাণে এনে দেয় পুলকের শিহরণ,
ঘুচে যায় হৃদয়ের কালিমার আবরণ।
ভালবাসি তোমাদের রেশমী ঘন চুল,
ভালবাসি মাকড়ির ঝালরের দুলদুল,
ভালবাসি তোমাদের ভালো আর মন্দ,
তোমাদের মাঝে পাই জীবনের ছন্দ।

ঈশ্বর বিশ্বাস

"একদা মহম্মদ এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে উন্মীলন করিয়া দেখেন যে এক মরুভূমীবাসী আরব অসিহস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিল, "মহম্মদ এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" মহম্মদ বজ্রনাদে উত্তর করিলেন "কেন? ঈশ্বর।"

এই কথা তড়িদ্বেগে আরবের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে তরবারী স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন মহম্মদ নিমেষ মধ্যে ভূমী হইতে তরবারী তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার হস্ত হইতে কে তোমায় রক্ষা করে?"

সে ব্যক্তি ভীতি কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আর কেহ না, এখন আমার জীবন আপনারই হাতে।"

মহম্মদ উত্তর করিলেন, "হা কাপুরুষ! এমন সময়েও তোর মুখ হইতে ইশ্বরের নাম বাহির হইল না। তোর মত অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে মারিলেও কলঙ্ক আছে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

———

("সৌরভ ছড়িয়ে চলে যাই মোরা
এমন সুন্দর মরতে।")

কয়েক শ্রেণীর আদি-জন্তু

অ্যামিবা।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

অতি আদিম উদ্ভিদ যেমন শেওলা, তেমনি অতি আদিম যুগের জন্তু অ্যামিবা। এরা এক-কোষ জীব। আকারে এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্রের লোনা জলে। এখন এদের খাল বিল ডোবা খানা প্রভৃতির জলেও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। খানিকটা জলে মাংস পচিয়ে সেই জল অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে তার মধ্যে অনেক অ্যামিবা দেখতে পাওয়া যাবে।

অ্যামিবার বিশেষ কোন আকার নেই। এদের মুখ চোখ কান নাক প্রভৃতি কোন অঙ্গ নেই। খায় এরা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। খাবার সামনে পেলে অ্যামিবা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ বাদে সেই খাদ্যটুকু আর দেখতে পাওয়া যায় না। সেই তার ভোজন। এদের ভোজন ব্যাপারটি অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কামড়াতে হয় না, চিবোতে হয় না, চুষতে হয় না; গিলতেও হয় না। গোটা শরীরটি এদের মুখও বটে উদরও বটে।

চলবার রীতিও এদের অতি অদ্ভুত রকমের। পা নেই যে হেটে চলবে, সাপের মত বুক পিঠও নেই। তবে চলে কী করে? চলবার প্রয়োজন হলে নিজের দেহকে দেয় সেদিকে বাড়িয়ে। সেই বর্দ্ধিত অঙ্গ দেখতে হয় একটি অঙ্গুলের মত। অঙ্গুলের মত করে নিজের দেহকে এক এক দিকে বাড়িয়ে এরা চলে। সেই জন্য অ্যামিবার বিশেষ কোন চেহারা নেই।

দেহটি থলথলে ও স্বচ্ছ। তার মধ্যে জলের ভাগই বেশী। জলের অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ কণা এদের খাদ্য। সামনে

পেলে এক অ্যামিবা অন্য একটি অ্যামিবা কণাকে আত্মসাৎ করতে দ্বিধা করে না।

এদের বংশবৃদ্ধি হয় অতি সহজে। এরা ডিমও পাড়ে না, উদরে ছানাও ধারণ করে না। যথাসময়ে আপন হতেই একটি অ্যামিবা দ্বিখণ্ড হয়ে হয় দু'টি। আবার সেই দুটি দু'ভাগ হয়ে হয় চারটি। চারটি হয় আটটি। এই ভাবে এরা নিজের দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করে বহু জীবে পরিণত হয়।

এরা বহু শাখায় বিভক্ত। এক শাখা রাত্রিতে সমুদ্রের জলে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করে। ইংরেজিতে এদের নাম নক্‌টিলুকা। বাংলায় বলা যেতে পারে রাতের বাতি। একটি দু'টি রাতের বাতিতে সমুদ্রের জল অতটা উজ্জ্বল দেখায় না। সমুদ্রের জলে এক এক জায়গায় এরা থাকে অগুন্তি সংখ্যায় ছড়িয়ে। সেখানে জলে নাড়া পড়লেই আলো ওঠে ঠিকরিয়ে।

(২)

স্পঞ্জ।

অ্যামিবার ঠিক উর্দ্ধ স্তরের জীব স্পঞ্জ। এদের গা-ময় কেবল ছিদ্র। এই স্পঞ্জ থেকেই বাংলার স্পঞ্জ রসগোল্লার নাম হয়েছে। এই ছিদ্রগুলিকেই এদের নাক মুখ কান সব বলা যেতে পারে। এদের মুখ নেই কিন্তু উদর আছে। উদরের ধারে ধারে বসানো আছে অসংখ্য শুঁয়ো। সেই শুঁয়ো নেড়ে নেড়ে উদরের ভিতরে এরা জল টেনে নেয়। সেই জলের মধ্যেই থাকে এদের খাবার। জলের সঙ্গে সেই খাদ্য যায় তাদের উদরে। যা খাদ্য নয় তা আবাব জলের সঙ্গেই বের হয়ে যায় অন্য দ্বার দিয়ে।

জলের মধ্যে এরা চলে না। চলার শক্তি এদের নেই। উদ্ভিদের মত জলেয় তলায় মাটি কাঠ বা পাথরের মধ্যে একই জায়গায় থাকে আবদ্ধ হয়ে। জলের তলা হতে টেনে তুলে আনতে বেশ জোর দিতে হয়। স্নানের সময় গা ঘসবার জন্য আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি তা এই স্পঞ্জ জীবের দেহেরই কঙ্কাল।

(৩)

জেলিমাছ ও প্রবাল কীট।

স্পঞ্জেরই স্বজাতী প্রবাল কীট ও জেলি মাছ। কিন্তু উভয়েই অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের। এদের নাক চোখ কান নেই। অথচ মুখ ও পেট আছে। মুখ দিয়ে ওরা যা খায় পেটে গিয়ে তা হজম হয়। এরাও জলের জীব। ওদের গায়ে আছে শুঁয়ো বসানো। সেই শুঁয়ো নেড়ে নেড়ে জল থেকে খাবার টেনে নেয় মুখের মধ্যে।

জেলি মাছ আকারে গোল। গোটা দেহটি জেলির মত থলথলে। তাই তাদের নাম জেলি মাছ। এদের গা থেকে ঝুলে আছে ঝালরের মত কতগুলি জিনিস। সে-গুলি তাদের দেহের শোভা নয়, এগুলি তাদের জলের মধ্যে শিকার ধরবার যন্ত্র। ঝালরের গায় বসানো আছে অসংখ্য বিষাক্ত হুল। সেই হুল ফুটিয়ে জলের ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট জন্তুকে ওরা কাবু করে। ঝালর গুলি জলের মধ্যে থাকে ঝুলে। মনে হয় কোন খাবার জিনিস যেন ঝুলছে। লোভে পড়ে যে আসে সেদিকে তাদের গায় সূচের মত বিঁধে যায়, ঝালরে বিষাক্ত হুল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা যায় অসাড় হয়ে। সমুদ্রে স্নান করবার সময় অনেক মানুষের গায়ও জেলি মাছের ঝালরের হুল বিঁধে যায়। বিছুটির হুলের মতো তার জ্বালা। হুলের বিষে গায়ে ফোসকাও পড়ে যায়।

প্রবাল কীটের গা-ও জেলি মাছের মত থলথলে। কিন্তু উপরে থাকে শামুকের খোলার মতো একটি শক্ত আবরণ। সেই আবরণটি ওরা তৈরী করে জলের চুন ও নানা জাতীয় ধাতু পদার্থ দিয়ে। প্রবাল-কীটের গা থেকে বের হয় ছোট ছোট গাঁজ বা আবের মত জিনিস। এই আব জমে জমে প্রবাল কীটগুলি বিভক্ত হয় নানা শাখা প্রশাখায়। তখন তাদের দেখায় গাছের ডালের মত। সমুদ্রের এক এক জায়গায় এত প্রবাল কীটের জন্ম হয় যে তা জমে জমে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে ওঠে। বঙ্গোপসাগরের লাক্কা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ প্রবাল কীটে তৈরী। উষ্ণ দেশস্থ সমুদ্রের জলেই সাধারণতঃ প্রবাল দ্বীপের জন্ম হয়।

মায়ের বিলাতের চিঠি

শ্রীকমলা দাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আদরের বাবলু ও টুলটুল,

১লা ডিসেম্বর—কাল সারাদিন ট্রেণেই কেটে গেল। বেলা ১টার ট্রেণ ধরে রাত ৭টায় রোমএ পৌঁছেছি। রাত্রে একটি হোটেলে উঠলাম। দেখলাম তোমার পিসিমা ও পিসেমশায় এখানে রয়েছেন। আজ সকালে তাঁরা ভেনিস চলে গেলেন।

রাত্রেই অশোক সেনের ভাই অরুণ সেন আমাদের হোটেলে এসে আলাপ করে গেলেন। বিদেশে বাঙ্গালীকে পেয়ে খুবই ভাল লাগলো। দেখলাম দুটি ভাইই বেশ আলাপী ও হাসিখুসী।

সকালে ৯টার সময় এখানকার টুরিং পার্টির সঙ্গে রোমের যা যা দেখবার দেখতে বার হলাম। মস্ত বড় বাসে করে সবাই চললাম। অন্য অনেক লোক ছিলেন।

প্রথমেই প্যানথিয়ন দেখালো। এটি ২০০০ হাজার বৎসরের পুরাতন মন্দির। খৃষ্ট ধর্ম্মের আরম্ভের পর এটিকে খৃষ্টানরা চার্চ্চ করে নিয়েছেন। এই গির্জ্জায় ইটালির রাজা ও বড় বড় অনেক আর্টিষ্টদের সমাধি আছে। এতদিন আমরা যত চার্চ্চ দেখেছি—সব যায়গায় দেখলাম, দেশের রাজ পরিবার ও বড় বড় লোকদের চার্চ্চের ভিতর সমাধি দেওয়া হয়। খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য যে সব সাধুরা প্রাণত্যাগ করেছিলেন, নানা স্থান থেকে তাঁদের অস্থি এনে এখানে পুঁতে রাখা রয়েছে। এই চার্চ্চের মাঝখানে যে গম্বুজ আছে তার উপরটি সর্ব্বদা খোলা রাখা হয়। শুধু ১লা নভেম্বর তার উপর একটি ভেলভেটের আবরণ দেওয়া হয়। ঐদিন সাধুদের সমাধিস্থ করা হয়েছিল বলে তাঁদের সম্মান দেখানো হয়।

এরপর রোমের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বহুকাল আগে সেখানে রাজপ্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি ছিল। ভূমিকম্প ও ভীষণ বন্যায় সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায়। ক্রমে সমস্ত মাটি চাপা পড়ে যায়। আবার লোকে তার উপর বাড়ী করেছিল। এখন খুঁড়ে সেই ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হচ্ছে।

এখানে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে, গেলাম সেণ্ট পিটার চার্চ্চে। এই চার্চ্চটি প্রথমে ১৪৫০ শতাব্দে তৈরী হয়। তখন এটি একটি ছোট গির্জ্জা ছিল। এখন এটি খুব বড় করা হয়েছে। খুব জমকালো এর ভিতরের কাজ। কত লোক এই চার্চ্চে বসতে পার জান? ৫৫,০০০—পঞ্চান্ন হাজার লোক। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় এই গির্জ্জা। সমস্ত চার্চ্চটি শ্বেত পাথরের তৈরী এবং কার্পেটের মত করে, মেজেতে মোজেফের কাজ।

প্রবাদ আছে, এইখানে রোমের নিষ্ঠুর সম্রাট হাজার হাজার খৃষ্টানদের ও সাধু পিটারকে হত্যা করেন! সেই জন্য সাধু পিটারের নামে চার্চ্চ হয়েছে। এখানে সাধু পিটার ছাড়া ১২১টি পোপের সমাধি আছে।

নানা রাস্তায় কতগুলি অতি পুরাতন ফোয়ারা দেখে আজকের বেড়ানো সাঙ্গ হলো। রাত্রে অরুণ সেন আমাদের হোটেলে এলেন। অনেক ক্ষণ গল্প করা গেল।

২রা রোমের টুরিং পার্টি তিন দিনে সমস্ত রোমটাই প্রায় দেখালো। কাল কতকটা দেখা হয়েছে। আজও ৯টায় বাস আসবে বলে তৈরী হয়ে নিলাম। মনে হয় একদিন বিশ্রাম নিলেই বুঝি ফাঁকি পড়বো। আর সময় নাই। তোমাদের কাছে ফেরবার সময় হয়ে এলো।

আজ সকালে মুসোলিনী ফোরাম, একটি আর্ট গ্যালারি ও কতগুলি বিখ্যাত পাথরের মূর্ত্তি দেখে এলাম।

বিকালে কয়েকটি চার্চ্চ দেখে কলোসিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে বড় বড় যোদ্ধারা বন্য জন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এটি রাজা ভেস—পাসিয়াম আরম্ভ করেন এবং ৮ বৎসর ধরে এটি তৈরী হয়। তোমরা বোধ হয় পড়েছ এইখানে খৃষ্টানদের উপর ভীষণ অত্যাচার হতো। এখানে অপরাধীকে বন্য জন্তুর সামনে ছেড়ে দেওয়া হত।

আমরা দুইদিন রোমের প্রায় সবই ঘুরলাম। সহরটির মাঝখান দিয়ে টাইপ্রাস নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীটি যদিও খুব বড় নয় কিন্তু যখন এই নদী রোমকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে তখন তাকে দেখে কে বলবে, ঐটুকু নদীর অমন ক্ষমতা!

৩রা—পোপের ভাটিকান সিটি দেখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এটি ছোট খাটো একটি সহর। এখান কার রাজা হচ্ছেন পোপ। রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড তাঁর প্রাসাদ। মহলের পর মহল, ঘরের পর ঘর। এই প্রাসাদে ঢুকেই দোতালার একটি ঘরে পোষ্ট আফিস আছে। এখানে ডাকটিকিট আলাদা। আমরা ও আমাদের দলের সকলে এখানে দাঁড়িয়ে এক একটী ছবিওয়ালা পোষ্ট কার্ড কিনে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে এখানেই পোষ্ট বাক্সে ফেলে দিলাম। এখানে তিন ঘণ্টা ধরে সমস্ত ঘুরে দেখলাম। এ দেশের যা দেখি সবই সুন্দর লাগে। সমস্ত ঘরগুলি আশ্চর্য্য ভাবে সাজানো। তা ছাড়া প্রথম যিনি পোপ হয়েছিলেন তাঁর ও তাঁর পরের সব পোপদের ব্যবহৃত জিনিষ সাজানো আছে। সবই রাজাদের মত মহামূল্য জিনিস।

এই প্রাসাদের একটি অংশে পোপ থাকেন। সেদিকে কেউ যেতে পায় না। তবে কেউ যদি আগে থেকে ব্যবস্থা করে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেণ্ট পিটার চার্চ্চের পাশেই "পোপ সিটি।"

বিকাল বেলা কয়েকটি চার্চ্চ ও একটি প্রদর্শনী দেখে এলাম। তার মধ্যে একটি চার্চ্চের কথা আজ তোমাদের কাছে বলবো।

চার্চ্চটির নামটা ঠিক বলতে পারছি না। ঐ চার্চ্চটি তৈরী হবার পর পাশের জমি খুঁড়তে খুঁড়তে অদ্ভুত একটি বাড়ী পাওয়া গিয়েছে তার নাম ক্যাটাকম্ব অফ সেণ্ট কলিক্সটাস। গাইডরা বললে যে অনেক অনেক বৎসর আগে ওখানে লোকে ঐ রকম বাড়ীতে থাকতো। বাড়ীটি খালি নীচু খিলানের উপর তৈরী। ভিতরে শুধু সরু সরু রাস্তার মত। দু' পাশের দেয়ালে এক জন মানুষ শুতে পারে এই রকম দুটি তিনটি করে তাকের মত। শুনলাম লোকে ঐ রকম গর্ত্ত শোবার জন্য ব্যবহার করতো এবং মারা গেলে যার যে গর্ত্ত তাকে সেখানে কবর দিত। এখন খুঁড়তে খুঁড়তে এই সব গর্ত্তে মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, যুবা অনেকের কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে।

মাটীর অনেক নীচে ঐ সব কবর পাওয়া গিয়েছে। আমরা একটা সুড়ঙ্গর ভিতর দিয়ে খুব নীচে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে সব দেখে এলাম একটু ভয়ও করতে লাগলো। নামবার সময়ে গাইড আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা

করে ছোট ছোট মোমবাতি দিয়েছিল সুড়ঙ্গ পথ আলো হবার জন্য। ঐ রকম বাড়ী ৬ মাইল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। সবই মাটীর তলায়।

আজ আমাদের এখানকার শেষ দিন। কাল ভেনিস যাবো। সেখানে ২।৩ দিন থেকে, সেখান থেকেই জাহাজে উঠবো।

৪ঠা সকালে ১০টার সময় ট্রেণে চড়ে ৬টায় ভেনিসে এলাম। ভেনিস ভারি মজার দেশ। এখানে সবই প্রায় জলের রাস্তা। ছোট বড় ক্যানাল রাস্তার কাজ করে। লোকে ষ্টিমার, নৌকা, মটর লঞ্চে করে যাতায়াত করে।

এটি খুব পুরাতন সহর। এখানে আগে কাছে কাছে খুব ছোট ছোট কতগুলি দ্বীপ ছিল। অনেক বৎসর আগে খৃষ্টানদের উপর যখন ভীষণ অত্যাচার হয়, তখন কয়েকজন পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বীপের ভিতরের জল পথ সব বাঁধিয়ে নেয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি এখন ব্যবসার একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভেনিসের বিশেষত্ব এখানকার কাচের কারখানা। সেখানে দেখলাম পেয়ালা, ডিস, ফুলদানির উপর কি করে ছবি আঁকছে। কি করে ঝাড় তৈরী হচ্ছে। আর কি চমৎকার পুঁতির মালা হচ্ছে। এখানে তিন দিন ছিলাম। জাহাজের যাত্রীরা সবাই একে একে এখানে এসে গেছেন।

৭ই সকালে উঠেই দেখি দলে দলে লোক গণ্ডোলায় করে জাহাজ ধরতে চলেছেন। জাহাজ বড় সমুদ্রে আছে। তাই সেখানে নৌকা বা গণ্ডোলা করে যেতে হয়। আমরাও দুপুরের খাওয়া শেষ করে লটবহর নিয়ে জাহাজে চড়লাম। এসে দেখি দলের সবাই এসেছেন। সন্ধ্যা ৭টায় জাহাজ ছাড়লো।

এবারেও জাহাজে ভীষণ ভিড়। প্রায় তিন শত সাড়ে তিন শত ইহুদি এই জাহাজে সাংহাই যাচ্ছে। তাদের দেখে বড় কষ্ট হলো।

৮ই বিকাসে ব্রিণ্ডিসি পৌঁছালাম। এখান থেকে তোমাদের ডাক্তার মামা (গোপাল দাদা) উঠলেন। আমরা দলে আরও ভারি হলাম। এবারেও কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলে এ জাহাজে চলেছেন।

১০ই—আজ বিকালে পোর্ট সৈয়েদ এসে পড়েছি। এবারেও নেমে ঘণ্টা তিন ঘুরে নিলাম।

১৪ই বেলা চারটার সময় এডেন এলো। এখানকার মাঝি মোল্লাদের দেখে মনে হলো স্বদেশে এসে পড়েছি। সবই মুসলমান, রং সব রকম মেশানো। বেশীর ভাগ কালো। এরা হিন্দী ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই কথা বলে। জাহাজ থামবার একটু পরেই পাশে সিঁড়ি নামলো। ছোট ছোট মোটর বোট এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো। দলে দলে লোক ডাঙ্গায় চললেন। অনেক দিন জল বাসের পর মাটীতে নামতে পাবে ভেবে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনেক যাত্রী এখান থেকে বোম্বাই যাবে বলে উঠলো।

আমি, তোমার বাবা, দিদি, মেজ মামা, গোপাল মামা ও ডাক্তার দাদু দু'খানি মোটর করে সহর দেখতে বার হলাম।

এডেন একটি মরুভূমির অংশ। সহরটী খুব ছোট। এখানে সমুদ্রের ধারেই একটী লবণের হ্রদ আছে। খুব ভাল নুন তৈরী হয়। মোটরে করে ঐ সব শুনতে শুনতে চললাম। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো। একটু ভয়ও করতে লাগল।

রাস্তায় তেমন আলো নাই। বেশীর ভাগ লোক আরব। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখলাম দলে দলে উটের পিঠে তারা যাতায়াত করছে। মাথায় কাপড় দেওয়া বিশাল চেহারা, দেখে ভয় করা কি অন্যায় ?—বিশেষ অপরিচিত যায়গা।

শুনলাম এখানে ১০০০ সৈন্য আছে। তারা উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত করে। মরুভূমি বলে সবাই উটের পিঠে চড়ে। অন্য কোন জন্তু চলতে পারে না। গাড়ীও উটে টানে।

বহুকাল আগে ভীষণ ভূমিকম্পে সারা এডেন সহরটির চারিদিকে গোল হয়ে একটি পাহাড় উঠেছে। সেটি একটি আশ্চর্য্য জিনিষ।

এখানে খুঁড়তে খুঁড়তে ১৫০০ বৎসরের পুরাতন একটা চৌবাচ্চা পাওয়া গেছে। পাহাড়ের ভিতর সেটি তৈরী। আরও দশটি ভীষণ বড় বড় চৌবাচ্চা আছে। শুনলাম এগুলি সেলুকাস তৈরী করেছিলেন। ঐ সব চৌবাচ্চাগুলি জল ভর্ত্তি হতে ছয় বৎসর লাগতো।

এখানে একটি ছোট যাদুঘরও আছে। সেটাও গাইড দেখিয়ে দিল। অল্প স্বল্প যা দেখবার দেখে ও সহরটা একবার চক্কর দিয়ে সাড়ে আটটার সময় জাহাজে চড়া হলো। রাত দশটায় জাহাজ ছাড়লো।

এইবার একেবারে বোম্বাই। সেখানে নেমে তার পরদিনই কলকাতায় যাবো। তারপর কি হবে বলোত ?

খু—ব আনন্দ—নয় কি ?

সমাপ্ত

জন্ম-দুঃখী

শ্রীতেজেশ চন্দ্র সেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মোজাঁদ্রো তার হারানিধি আবার ফিরে পেল।

সে তাকে নিয়ে চলল তার জন্মভূমি সুদূর নেভাদা প্রদেশের দিকে। রেলগাড়ির কামরায় বেঞ্চের গদির উপর দুজনে বসেছে মুখোমুখী হয়ে। কামরার ভিতরে যাত্রীদের গুঞ্জন ও কোলাহলের মধ্যে মোজাঁদ্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কেবল তার ছেলের মুখের দিকে।

এ যেন জোর করে কোন জিনিস চুরী করে নিয়ে যাওয়া। সে কাউকে একবার ধন্যবাদও দিলে না, কারোর নিকট একটু কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলে না। গেঁয়ো লোক একটা বড় রকমের লটারী জিতলে যেমন ছোটে বাড়ীর দিকে মোজাঁদ্রাও তেমনি ছুটে চলেছে তার ছেলেকে নিয়ে।

সে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার ছেলেকে তার পুরানো স্নেহ-বন্ধনের মধ্যে থাকতে দেবে না। আজ তার পুত্রস্নেহ তার পুরানো টাকার মায়াকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। তার ছেলের উপর অন্যের স্নেহের দাবী সে আর কিছুতেই সইবে না। আজ থেকে তার ছেলে সম্পূর্ণ তারই।

একস্‌প্রেস্ গাড়ি চলার বিচিত্র ধ্বনির ন্যায় তার মাথার ভিতরেও আজ যেন কী বাজতে লাগলো। তার মাথাও আজ গরম হয়ে উঠেছে ইঞ্জিনের বয়লারেরই মত হয়ে। তার মনের স্বপ্ন

আজ ছুটে চলেছে দিন, মাস, বৎসরকে ছাড়িয়ে অতি প্রচণ্ড গতিতে। কোন ইঞ্জিন, কোন একস্‌প্রেস গাড়ির সাধ্য নেই যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে।

তিনি কী স্বপ্ন দেখছেন? তিনি দেখছেন ভিক্টর হয়েছে বনবিভাগ স্কুলের নতুন ছাত্র। তার চেহারা গেছে বদলে। গায়ে তার স্কুলের সবুজ রঙ্গের জমকালো কোর্ত্তা।. তাতে জায়গায় জায়গায় বসানো আছে নানাবিধ রূপোর কাজ। কী জমকালো, কী ঝক্‌ঝকে সে পোষাক! কোমরে তার ঝুলছে তলোয়ার, মাথায় দ্বিকোন টুপি। জগতের যেখানে যত রকমের সুন্দর পোষাক থাকতে পারে মোজাঁদ্রো স্বপ্নে তাই তার ছেলের গায় দেখতে লাগলেন।

যে-পোষাকই হোক না তাতে সোনা রূপোর কাজের অভাব হবে না। মোজাঁদ্রো কাঠের ব্যবসায় টাকা জমিয়েছে প্রচুর। তার টাকার অভাব কি? ভিক্টরকে সে প্যারী নগরীর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি করে তুলবেই, তাতে যত সোনা যত রূপোরই দরকার হ'ক না।

লোকে যখন তার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আসবে তখন আগে সকলে তার সামনে টুপি খুলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াবে।

বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলারা আসবে বিয়ে করবার জন্য ভিক্টরের সঙ্গে ভাব করতে।

তখন ঘরের এক কোণে বসে থাকবে একটা বুড়ো। সে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সগর্ব্বে বলবে—"এই আমার ছেলে, এদিকে এসতো বাছা।"

এদিকে বুড়োর সেই বাছাও গাড়িতে বসে স্বপ্ন দেখছিল। মাথার টুপিটা মুখের উপর টেনে দিয়ে সে বসে বসে কেবলি কাঁদছিল। তার বাবা যাতে তার চোখের জল দেখতে না পায় সে জন্য সে টুপিটা টেনে দিয়েছিল মুখের উপরে। তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে বড় তাড়াতাড়ি। বিদায়ের সময় ক্লেরা তার মুখে যে চুমো দিয়েছিল তা এখনো সে ভোলেনি। লুভো বেচারাত তার দিকে একবার মুখ তুলে চাইতেও পারলে না, আর মা-লুভো! কাঁদতে কাঁদতে তো তার চোখ উঠেছিল লাল হয়ে। মিমিল্ বেচারী ছোট একটী বাটীতে করে এনে দিল তাকে সুপ খেতে। সকলে এমন কি মিমিলও কাঁদতে লাগলো। তাকে ছেড়ে তারা আজ কি করে থাকবে, আর সেই বা কি করে ছেড়ে থাকবে? ভবিষ্যতের বন-বিভাগের সম্ভ্রান্ত ছাত্র এই কথা মনে করে এতটা কাতর হয়ে পড়ল যে সে তার বাবার কথার উত্তরে শুধু 'হাঁ' ও 'না' না ভিন্ন আর কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না।

কিন্তু তার দুঃখের শেষ এখানেই নয়। শুধু টাকা হলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হওয়া যায় না—তার জন্য ত্যাগও করতে হয় যথেষ্ট, দুঃখও ভোগ করতে হয় অনেক।

সে দুঃখ রেলগাড়িতে বসে বসেই ভিক্টর কিছু কিছু অনুভব করতে লাগল। গাড়ি যখন নেভারের প্রান্তবর্ত্তী উপনগরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল তখন সহরের সরু সরু গলি, রাস্তা, রাস্তার দুধারের পচা নোংরা নর্দ্দমা, ছোট ছোট ঘর তার দরজা জানালার ছেঁড়া ময়লা পর্দ্দা প্রভৃতি দেখে তার শৈশব জীবনের দুঃখময় স্মৃতি সব একে একে তার মনে জেগে উঠলো।

গাড়ি ষ্টেশনে আসলে তারা গাড়ি হতে নেমে একটা শান বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। রাস্তায় লোকজন গাড়ি ঘোড়ার অন্ত নেই, সকলে

ভিড় করে ঠেলাঠেলি করে চলেছে। মোজাঁদ্রো একটা গাড়ি ডেকে তার উপর চেপে বসলেন। মোজাঁদ্রো তার সংকল্প ভোলেন নি। ভিক্টরকে রূপান্তরিত করতে হবে আজই এখনই। তিনি গাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠলেন একেবারে দর্জ্জির দোকানে। এই দোকানে বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রদের জন্যই পোষাক তৈরী হয়।

চক্‌চকে টেবিল, চেয়ার, আলমারি, আয়না প্রভৃতিতে দোকানটী একেবারে ঝক্‌ঝক করছে। দামী ঝক্‌ঝকে উর্দি-পরা বেয়ারা চাপরাশির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে দোকানের এদিক ওদিকে। দোকানের সামনে খদ্দেরের গাড়ি থামলেই তারা ছুটে এসে তাদের অভ্যর্থনা করে দোকানে নিয়ে বসাচ্ছে গদি আঁটা চেয়ারে, কৌচে।

মোজাঁদ্রোকেও তারা আদর করে কৌচের উপর বসাল।

ম্যানেজার একটা খুব দামী পোষাক হাতে নিয়ে তার ঝক্‌ঝকে রূপোর বোতাম ও হাতে ও বুকে সোনালী কাজ করা প্লেট প্রভৃতি দেখিয়ে বলল, "কর্ত্তা, এই পোষাকে আপনার ছেলেকে খুব মানাবে। দেখে মনে হবে যেন সৈন্যদলের একজন বড় জেনারেল।"

তখনি দোকানের বড় দর্জ্জি এসে ভিক্টরের হাতের বুকের পিঠের মাপ নিল। বন-বিভাগের ভবিষ্যৎ ছাত্রের মনে তখন জেগে উঠল পূর্ব্ব স্মৃতি। চোরা ভাল মানুষ লুভোর হাসিভরা মুখ, মা-লুভোর সঙ্গে তার সরল ঠাট্টা, স্বামীর সেই ঠাট্টায় মা-লুভোর সক্রোধ উত্তর, ক্লেরা, মিমিল—একে একে সকলের কথাই তার মনে হতে লাগল।

এ সবই তার অতীত জীবনের স্মৃতি। সে জীবন সে আর ফিরে পাবে না। দোকানের আয়নায় আজ সে নিজের চেহারা যা দেখতে পেল 'বেলনিভারনের' চেহারার সঙ্গী তার কোন মিলই নেই। একেবারে নতুন হালফ্যাসনের দামী জমকালো পোষাকে তাকে দেখাতে লাগলো যেন প্যারী নগরীর সে একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! 'বেল নিভারণের' ভিক্টর, পূর্ব্বে শত তালি-দেওয়া বহুদিনের পুরাণো পোষাক ভিন্ন নতুন পোষাক সে কোন দিন চোখেও দেখতে পায়নি।

দোকানের ম্যানেজার অতি অবজ্ঞার সঙ্গে জুতোর গোড়ালির গুঁতোয় ভিক্টরের পুরাণো পোষাকটা দিল দূরে এক কোণে একটা টুলের নীচে সরিয়ে। ভিক্টরের মনে হল সেই পুরাণো পোষাকের সঙ্গে তার পুরাণো জীবনেরও অনেক-খানি তাকে ছেড়ে চলে গেল বহু দূরে সরে। সেই 'অনেকখানি' যে কতখানি একমাত্র সেই তা জানে! এমন কি সেই স্মৃতিকেও আজ তার আর মনে পোষণ করবার অধিকার নেই।

কলেজে প্রথম দিনেই অধ্যক্ষ মহাশয় খুব গুরু গম্ভীর কণ্ঠে তাকে জানিয়ে দিলেন "দেখ বাপু এখানে কিন্তু তুমি আগের মত চলতে পারবে না, পূর্ব্বের শিক্ষাদীক্ষা সব তোমাকে ভুলতে হবে। তোমার পুরাণো আচার ব্যবহার সব শোধরাতে হবে।"

এই শোধরানোর কাজ খুব দ্রুতই হতে লাগল। প্রথমেই স্থির হল মাসে একদিন মাত্র সে বাড়ী যেতে পারবে, তার বেশী নয়।

প্রথম দিন সে বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত্রি কেবল কেঁদেই কাটালো।

(ক্রমশঃ)

সুবুর প্রলোভন

সুবু গাছের ছায়ায় ঘেরা রাস্তা দিয়ে চলেছে—গুণ্ গুণ করে গানও গাইছে। আকাশ পরিষ্কার, রোদ্র ঝক্ ঝক্ করছে—পাখীরা সুমিষ্ট গান গাইছে। আর তখন তার চোখ পড়লো জমিদার রমেন বাবুর বাগানের দিকে—কি সুন্দর সুন্দর রঙ বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে আর বেল, যুঁই, গন্ধরাজের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। সেই সময়ে জমিদার গৃহিনী বাগানে বেড়াচ্ছিলেন—তিনি সুবুকে দেখে বললেন, সুবু, লক্ষ্মী ছেলে, আমার একটা কাজ করে দেবে?

সুবুর বাবা এই জমিদারের প্রজা ও তাঁর জমিদারীর হিসাবের কাজ করেন।

সুবু তখনি বলল, হাঁ, মাসিমা, নিশ্চয়ই করব।

তিনি বললেন, আজ আমি দুপুরে খাবার জন্য কয়েক জন লোককে নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি ত দেখছি বাজারেই যাচ্ছ। যদি বারটা ন্যাংড়া আম আমার জন্য নিয়ে এস তো বড় উপকার হয়।

তিনি তাকে এক টাকা দিলেন। সুবু বাজারে গিয়ে আম কিনলো। আমওয়ালা এক টাকায় তাকে ১৩টা আম দিল।

সুবু তার কাজ সেরে আম কটি আলাদা ঝাড়নে বেঁধে জমিদারের বাড়ীর দিকে চলল। রাস্তায় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে সুপুষ্ট, পাকা, রসালো আমগুলির দিকে তাকালো। আর সেগুলি কেমন বড়—এমন সুন্দর আম সে অনেক দিন দেখেনি।

সে মনে মনে ভাবল, এমন আম একটা যদি আমি খেতে পেতাম!

সে আম খুব ভালবাসত। সে কি জমিদার গৃহিণীর কাছে একটা আম চাইবে? তারা যে বড় গরীব, ন্যাংড়া আম কি করে কিনবে?

তখন তার মনে হল, তিনি ত ১২টা আম আনতে বলেছিলেন কিন্তু পাওয়া গেল ১৩টা আম। তিনি ১২টাই চান।

সুবু ভাবল, আমি যদি এর থেকে একটা নিই তাতে আর কি ক্ষতি হবে!

সুবু একটা আম বার করে তার পকেটে রাখল। তারপরে চল্‌তে লাগল। কিন্তু তার মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করতে লাগল। বোঝাগুলি যেন আগের চেয়ে বেশী ভারী মনে হতে লাগল। সূর্য্যের আলোও যেন ম্লান হয়ে গেছে, পাখীর গানও তেমন মিষ্টি লাগছে না।

সে মনে মনে বলতে লাগল, শুধু একটা আম নেবো—তাতে আর অন্যায় কি—বারোটার বেশী আম ত তাঁর দরকার নাই—বারোটার কথাই ত বলে দিয়েছেন!

কে যেন তার মন থেকে বলে উঠল—সুবু, এ আম ত তোমার নয়।" সুবু যদিও সকালে মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছে তবু যেন তার মনে হল তার ক্ষিদে পেয়েছে। আর একটা আম খেলে এমন কি তার পেট একেবারে বেশী ভরে যাবে!

আর বাজারের বোঝা বইতে বইতে ত কষ্ট হচ্ছে, ক্লান্তিও লাগছে! এত দূর জিনিষ বয়ে নিয়ে এলাম তার জন্য ত কিছু পাওয়াও উচিত!

এত রকম কারণ দেখান সত্বেও তার মনে যেন শান্তি পাচ্ছে না। তার মা যে বড় ভাল। মা যে কতবার তাকে আদর করে, কোলে বসিয়ে, বলেছেন, অন্যায় করে শুভ্র সুন্দর পবিত্র মনকে, আর পরের জিনিষ না বলে নিয়ে ও চুরি করে হাত দুটিকে কলঙ্কিত করো না।

সে এই কথা মনে করে পকেট থেকে আমটি বার করল। এই আমটির জন্য তার যেমন লোভ হয়েছে জীবনে কোন জিনিষের উপর এত লোভ হয় নাই। কিন্তু তা হলেই বা কি হবে! সে তখন সেটা ঝাড়নে বেঁধে রাখল। তারপরে সে হন্ হন্ করে চললো আর একেবারে জমিদার বাড়ীতে এসে থামলো। সে জমিদার গৃহিণীকে বলল, মাসিমা এক টাকায় ১৩টা আম দিয়েছে।

সুবু মনে মনে ভাবছিল মাসিমা বোধ হয় তাকে বেশী আমটা খেতে দেবেন।

জমিদার গৃহিণী আমগুলি গুণে নিয়ে বললেন, তাইত ১৩টাই ত দিয়েছে। আমগুলিও কি সুন্দর—আবার একটা বেশীও দিয়েছে। ও! সকলে খুব খুসী হয়ে খাবে। সুবু, তুমি আমার বড় উপকার করলে!

সবু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল যে তিনি সব আমগুলি ভাঁড়ার ঘরে এক ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখছেন। সে আমটি না পেয়ে নিরাশ হয়ে গেল। মনটা ওই আমটা পাবার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে যেতে লাগল। তারপরে সে একটা লাফ দিয়ে বলে উঠল—যাক্ ভালই করেছি আমটা যে নিই নাই। আর কেহ না দেখলেও ভগবান ত দেখতেন। সেই গানটি তার মনে পড়ল—

"আলোক আঁধারে কিবা, চেয়ে আছ নিশি দিবা,
তোমার চোখের দূরে নহে কোন জন,
তুমি যে গো সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ।"

আর মাকে এ কথাটা না বলেও ত থাকতে পারতাম না। আর যদি একবার আমটা নিয়ে খেয়ে ফেলতাম আর ত সে আমটা ফিরিয়ে দিতে পারতাম না! চির জীবন চোর বলে একটা কলঙ্কের দাগ থেকে যেত। আর একটা আমের জন্য! ছি! ছি! যাক্, এখন মনটা বেশ হাল্কা হয়েছে! কি আনন্দ।

এখন সূর্য্যের আলো তার কাছে উজ্জ্বল লাগতে লাগল আর পাখীর গানও মিষ্টি মনে হল।

খেলার বিয়ে

শ্রীসুরুচিবালা সেন গুপ্তা

(শোলাঙ্কি রাজ অন্তঃপুর। বালিকা রাজ কন্যা ও সহচরিগণ)

রাজকন্যা। আজ ভাই হোরি উৎসব; চার্ দিক্ আবির কুম্‌কুমে কেমন রাঙ্গা হয়ে উঠেছে ছাখ। আকাশের ঐ পাশটাতেও কে যেন আবির গুলে দিয়েছে। দেবতাদের মেয়েরাও বুঝি আকাশে আবির খেলছে।

শুচিতা। তা হবে।

রাজকন্যা। বাড়ীর কাছে যে বন আছে, ঐখানে গিয়ে আমরা হোরি খেলি গে চল্। বনের কাছেই কেমন খোলা মাঠ, ছুটোছুটি করে বে-শ খেলব। না ভাই?"

বিনতা। (হাততালি দিয়া বলিল) চল্ ভাই চল্, আর দেরি করিসনে।

(বাড়ীর পাশে বনে ছুটিয়া গেল)

রাজকন্যা। দেখেছিস্ ভাই, বনটাকে আজ কী ভালই লাগছে। কী মিষ্টি হাওয়া। কী মিষ্টি ফুলের গন্ধ। পাখীগুলো মাথার উপর উড়ে উড়ে কেমন মিঠে গান গাইছে। সারি সারি গাছের ছায়া কেমন ঠাণ্ডা। আয় ভাই আমরা হোরি খেলি। আবির কুম্‌কুম এনেছিস্ তো?

বিনতা। হাঁ, এনেছি পিচকিরিও এনেছি।

শুচিতা। রাজকুমারি, আজ দোল্ উৎসব। এসোনা,গাছের ডালে দোল্না বেঁধে আমরা দুলি।

রাঃ কন্যা। কিন্তু ভাই দোল্না বানাবো কি দিয়ে, আমাদের তো দড়ি নেই।

বিনতা। ঐ যে মাঠে একজন রাখাল বালক গরু চরাচ্ছে, ওর কাছে চাইলে ওকি একগাছা দড়ি দেবে না?

রাজকন্যা। (চেঁচাইয়া বলিল) ও রাখাল ছেলে, শুন্‌ছো? একবার এদিকে একটু এসোনা ভাই!

(রাজার ছেলে বালক বাপ্পা, রাজ্য হারাইয়া এখন গরু চরাইতেছে। রাজকন্যার ডাক শুনিয়া কাছে আসিল)

বাপ্পা। আমাকে তোমরা ডেকেছো?

রাজকন্যা। হাঁ ডেকেছি। আজ কি না দোল্ উৎসব, তাই আমরা দোল্না বানিয়ে দোল খেলতে চাই। কিন্তু আমাদের তো দড়ি নেই। কি দিয়ে দোল্না বানাব বল? তোমার গরুর গলা থেকে এক গাছা দড়ি খুলে দাও না। আমাদের দোল খেলা হয়ে গেলে আবার তোমার দড়ি ফিরিয়ে দেব।

বাপ্পা। তোমরা কে?

রাঃ কন্যা। (হাসিয়া বলিল) আমি এই দেশের রাজার মেয়ে। এরা আমার খেলুড়ে। অত খবরে তোমার কাজ কি ভাই? তোমার দড়ি নিয়ে তো আর আমরা পালিয়ে যাব না। দোল্ খেলা হলেই ফিরিয়ে দেব। দাও না দড়ি, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বাপ্পা। দড়ি আমি দিতে পারি, তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর।

রাঃ কন্যা। (হাসিয়া বলিল) ও বিনু, ও শুচি, তোরা শুনেছিস্ ওকে আমি বিয়ে না করলে ও দড়ি দেবে না।

শুচিতা। তা সে আর এমন শক্ত কথা কি? কর্ না বিয়ে। নইলে তো ও দড়ি দেবে না, দোল্ খেলাও হবে না।

রাঃ কন্যা। আচ্ছা বেশ, কর্ব বিয়ে দাও, এবার দড়ি, দাও শীগ্গীর।

বাপ্পা। না, আগে বিয়ে হোক্, তারপর দড়ি দেব।

বিনতা। বেশ, তাই হবে। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে সারতে হবে।

শুচি। কি করে বিয়ে হয়, সে আমি খুব ভাল করে জানি। আয় ভাই বিনু, আগে বনের ফুলে দু'গাছি মালা গেঁথেনি।

বিনতা। মালা গাঁথা হয়েছে, এবার কনে, তুই ভাই বরের চার্দিকে সাতবার ঘুরে আয়।

শুচিতা। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে ছাখ, শুভ দৃষ্টি হোক। (দু'জনে হুলু দিয়া উঠিল)

বিনতা। এবার দু'জনে দু'গাছি মালা নিয়ে মালা বদল কর। শাঁখ তো নেই শুচি, কি হবে।

বিনতা। এই যে পাতা দিয়ে বাঁশি বানিয়েছি। এই আমাদের আজকের শাঁখ। এতো খেলার বিয়ে, সত্যিকার শাঁখ নেই বা থাকল। (বাঁশি বাজাইল)।

শুচি। এবার কনের ওড়নার সঙ্গে বরের কাপড়ের খুঁটে গাঁটছড়া বেঁধে দি। কেমন? বিয়ে হল ত? এখন দাও দড়ি।

বাপ্পা। তোমরা পিচ্কারী খেলবে না? আমিও তোমাদের সঙ্গে খেল্ব।

বিনতা। আমরা যে দোল খেলব, হোরী খেলা হয়ে গেছে।

বাপ্পা। ব্বাঃ! নতুন বরের গায়ে তোমরা আবির কুম্কুম দেবে না?

বিন শুচি। কনে ভাই, তোর বরের গায়ে তুই আবির কুম্কুম দে, আমরা চললুম দোল্না বাঁধতে।

(রাজকন্যা বাপ্পার গায়ে পিচকারী দিয়া আবির ঢালিয়া দিল)।

বা। তুমি আমার গায়ে দিলে, আমিও তোমার গায়ে দিই, শোধ বোধ হয়ে যাক্—।

রাজ ক। আমার ঠোঁটে গালে, এত আবির দিলে কেন? মা যে বক্বেন।

বা। না, বকবেন না। চল, এবার দোল খেলবে। তোমরা তিনজন দোল্নায় বস, আমি দোল দিয়ে দিই।

গান।

দে দোল্, দে দোল্ দোল্
বসন্ত পঞ্চমী শাখে শাখে ফোটে সহকার বোল্
আকাশে মেঘ ভাঙা, আবিরে রাঙা রাঙা
দখিনা হাওয়া উতরোল।
কুসুম শাখে শাখে, ছুটিছে লাখে লাখে
দিকে দিকে কোয়েলার বোল্
দে দোল্ দে দোল্ দোল্।

(তিনজন দোল্‌নায় বসিলে বাপ্পা গান গাহিয়া দোল দিতে লাগিল।)

বিন। সন্ধ্যে হয়ে এল শুচি, রাণীমা বকবেন চল এবার বাড়ী যাই।

রা ক। খেলার বর, এবার তোমার দড়ি ফিরিয়ে নাও, আমরা বাড়ী যাই।

বা। দড়ি আমার চাইনে, দোলনা বাঁধা থাক। তুমি মাঝে মাঝে এসে এই দোলনায় দুলে তোমার খেলার বরকে মনে করো।

রা ক। তবে তো ভালই হল। খেলার বর, এবার বিদায়।

বা। খেলার কনে, মনে রেখ, ভুলে যেয়োনা।

শুচিতা বিনতা। খেলার বর বিদায়।

(২)

(দু'চার বছর চলে গেছে। রাজকন্যা এখন কিশোরী। তার পিতার সভা গৃহে সে পিতার কাছে বসে আছে। সম্মুখে রাজ জ্যোতিষ তার করকোষ্ঠি বিচার করছেন)।

রাজা। গণক ঠাকুর, আমার কন্যার বিয়ের বয়স হয়েছে, বিচার করে দেখ, কোথায় কত দিনে কন্যার বিয়ে হবে।

জ্যোতিষ। (রাজকন্যার কর-পত্র দেখিতে দেখিতে বলিছেন) মহারাজ আপনার কন্যা অতি সুলক্ষণা। কিন্তু একি মহারাজ, একি অসম্ভব ব্যাপার!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে বলিলেন) কি হয়েছে গণক ঠাকুর? খুলে বল।

জ্যো। মহারাজ, আপনার কন্যা তো বিবাহিতা। পূর্ব্বেই কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে।

রাজা। আপনি এ কি বাতুলের ন্যায় কথা বলছেন? এ-ও কি সম্ভব যে আমার অজ্ঞাতে আমার এই বালিকা কন্যার পরিণয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়েছে?

জ্যো। হাঁ মহারাজ, আমার গণনা অব্যর্থ। আপনার কন্যা বিবাহিতা।

রাজা। কবে কার সঙ্গে বিয়ে হল কিছু বলতে পারেন?

জ্যো। অতি বালিকা বয়সে এক বালকের সহিত যথারীতি বিবাহ হয়ে গেছে।

রাজা। (উত্তেজিত হইয়া বলিলেন) কার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাকে না জানিয়ে আমার বালিকা কন্যার পাণি গ্রহণ করেছে? প্রহরি, রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, যে এই দুর্বৃত্তকে ধরে দিতে পারবে, তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।

(৩)

(রাজার অন্তঃপুর। রাজকন্যা মায়ের কাছে বসে আছে।)

রাণী। মা, তোর বিয়ে দিয়ে কত সাধ আহ্লাদ করব আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা সে আশায় বাদ সাধলেন।

রা ক। কেন মা?

রাণী। তুই কি শুনিস নি যে, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতীষ তোর হাত দেখে বলেছেন যে একজন বালকের সঙ্গে তোর নাকি আগেই বিয়ে হয়ে

গেছে। আচ্ছা তোর যদি বিয়ে হয়েই থাকে, তবে তুইত জানিস কার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে, বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে তোর? কে বর?

রা ক। আমার খেলার বরকে আমি চিনি। সত্যিকারের বরকে ত আমি চিনিনে মা!

রাণী। (আগ্রহ করিয়া বলিলেন) খেলার বর! সে কী ব্যাপার? সব বল দেখি আমাকে।

রা ক। (উৎফুল্ল হইয়া বলিল) সে এক ভা-রী মজার কথা মা! অ-নেক দিন আগে হোলী উৎসরের দিন আমাদের খেলার বিয়ে হয়েছিল।

রাণী। কেমন করে বিয়ে হ'ল? বর হল কে?

রা ক। আমি, শুচি, বিনুর সঙ্গে বসন্ত পঞ্চমীর দিন ঐ বনে হোলী খেলতে গেছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের দোল খেলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু দড়ির জন্য দোলনা বাঁধতে পারলাম না। তখন ঐ মাঠে একজন রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল, তার কাছে আমরা একগাছা দড়ি চাইলাম। রাখাল ছেলে খু-ব ভাল মা! সে তার গরুর গলার দড়ি খুলে গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দিল। দোলনাটা এখনও আছে মা, আমি রোজ তাতে দোল খাই। তুমি দেখবে চল মা!

রাণী। দোল খেললি ভাল কথা, কিন্তু বিয়ের কি দরকার হল?

রা ক। সে যে বললে তাকে বিয়ে না করলে সে দড়ি দেবে না।

রাণী। সেই রাখাল ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হল?

রা ক। হ্যাঁ—

রাণী। কি ক'রে বিয়ে হল?

রা ক। (উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল) শুচি, বিনু বনের ফুল দিয়ে বিনে সূতোয় মালা গেঁথে দিলে, আমি ওর চার দিকে সাতপাক্ ঘুরে এলাম, শুভদৃষ্টি হল, মালা বদল হল। ওরা উলু দিলে, শাঁখ নেই বলে পাতা দিয়ে বাঁশি বানিয়ে ফুঁ দিলে। আমাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিলে বিয়ে হয়ে গেল।

রাণী। (খেদ করিয়া বলিলেন) হায়, হায়, তবে তো বিয়ে হয়েই গেছে। তুই রাজার মেয়ে হয়ে একটা রাখাল ছেলেকে বিয়ে করতে গেলি কেন?

রা ক। সত্যিকারের বিয়ে নয় মা, খেলার বিয়ে। কি করব বিয়ে না করতে তো দোল খেলা হত না।

রাণী। সেই রাখাল ছেলে যাবার সময় তোকে কি বলে গেল? সে কোথায় আছে জানিস

রা ক। যাবার সময় সে বলে গেল, রোজ দোলনায় দুলবে, তোমার খেলার বরকে মনে রেখ। ভুলে যেও না। আমি সত্যি তাকে ভুলি নি, কিন্তু সে কোথায় আছে আমি জানিনে ত।

রাণী। মহারাজকে বলে তার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখি। কী বিপদেই পড়া গেল।

(৪)

(গোচারণ মাঠ। রাখাল-বেশী বাপ্পা গরু চরাইতেছে)

বা। কত দিন হয় গরু চরাচ্ছি, কোনদিন ত এমন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই কাল গরুটার দুধ খুব মিষ্টি কিন্তু আজ ক'দিন হয় গরুটার দুধ কম হচ্ছে কেন? গরুর মালিক সন্দেহ করছেন যে আমিই দুধ চুরি করে খাই। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! আজ আমি গরুর পেছনে পেছনে যাব দেখি দুধ কে চুরি করে খায়।

গান।

প্রাণ কি যে চায়—
কিসের পিছনে ছুটি কিসের মায়ায়
বাঁধিনু যে ঘর আশা করে
ভেঙ্গে প'ড়ে গেল দারুণ ঝড়ে
জীবন প্রভাত ঢাকা অমানিশায়।

কাল গরুটা দেখি মাঠ ছেড়ে বনে এসে ঢুকলো। একটু অড়োলে থেকে দেখি কে ওর দুধ দুয়ে নেয়। একি! এ যে ঋষির আশ্রম। শিবের সম্মুখে এক প্রশান্ত মূর্ত্তি যোগী ধ্যান করছেন। গাইটা ওই শিবের উপরে বাঁট রেখে দাঁড়াল আর তার বঁ ট থেকে ঝর্ ঝর্ করে দুধ পড়ে শিবকে স্নান করিয়ে দিলে। মূক জন্তুর কী দেবভক্তি!

(যোগী চোখ খুলে চেয়ে দেখলেন, বাপ্পা জোড় হাতে সম্মুখে বসে আছে)।

যোগী। কে তুমি সুদর্শন বালক? কপালে তোমার রাজটিকা, নয়নে অসামান্য প্রতিভা, কে তুমি? কি চাও?

বা। (প্রণাম করিয়া বলিল) আমি রাখাল গোচারণ করি। আমার নাম বাপ্পা। আপনার আশীর্ব্বাদ চাই, আর কিছু চাই না।

যোগী। রাখাল? না—তুমি ত রাখাল নও বাপ্পা! তোমার ললাটে রাজটিকা, তোমার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত। তুমি রাজা হবে।

বা। আমি শক্তিহীন বালক, কি উপায়ে রাজ্য লাভ করব?

যোগী। তোমার বাল্যকালে তোমার পিতাকে নিহত করে শত্রু তোমার পিতৃরাজ্য অধিকার করেছে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি তোমার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে সিংহাসন লাভ করবে। এই নাও মন্ত্রপূত তরবারি, এই তরবারির সাহায্যে তুমি শত্রু নাশ করবে।

বা। কিন্তু প্রভু, আমি এই আশ্রম থেকে আপনার চরণ সেবা করতে চাই।

যোগী। না, বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে, তুমি অলস জীবন যাপনের জন্য জন্ম গ্রহণ কর নাই। তা ছাড়া শোলাঙ্কি রাজ তোমার বধের আদেশ দিয়েছেন, এ রাজ্য তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়, তুমি প্রস্থান কর।

বা! আমি ত মাঠে গোচারণ করি, শোলাঙ্কি রাজের কোন ক্ষতি ত করি নাই, তিনি কেন আমার প্রাণ নাশের আদেশ দিয়েছেন।

যোগী। খেলাচ্ছলে তুমি তাঁর বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেছ। একজন গোপালোকের এই ধৃষ্টতা তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি।

বা। আমার সেই খেলার বিয়ে।

যোগী। আর বিলম্ব করো না, তুমি পালাও।

(৫)

(চিতোর। রাজবেশে বাপ্পা)।

বা। যুদ্ধ শেষ হল। যোগীবরের মন্ত্রপুত অস্ত্রের সাহায্যে আমি শত্রু জয় করেছি। এই আমার পিতৃ পুরুষের বাসভূমি! তাঁদের পদধূলি এ স্থানকে পবিত্র করে রেখেছে। পূর্ব্ব পুরুষের রাজদণ্ড এখন আমার হাতে। এই রাজদণ্ড যেন আমি সুপরিচালনা করি, ভগবানের কাছে এই আমার ভিক্ষা। দূত এসে বললে আমার খেলার কনে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। রথ, সৈন্য, বাদ্য ভাণ্ড পাঠিয়ে তাকে রাণীর সমাদরে আনতে হবে। আমার সেই খেলার বিয়ে আজ সত্যি হ'ল? কি আশ্চর্য্য, সেই খেলার বিয়ে!

(শোলাঙ্কি রাজ অন্তঃপুরে বসিয়া রাজকন্যা ভাবিতেছিল)

আমার খেলার বর আমাকে নেবার জন্য বাদ্য ভাণ্ড দিয়ে রথ পাঠিয়েছেন। তিনি তো রাখাল নন, তিনি রাখাল রাজা। কি আশ্চর্য্য! খেলার বর! খেলার বিয়ে!

নিখিল কর্ণাটক বালক বালিকাদের সমিতি

তোমরা শুনে আনন্দিত হবে যে সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এক সভা করেছিল। এটা তাদের চতুর্থ নিখিল কর্ণাটক বালক বালিকাদের সভা। এই সভার সব কাজই ছোট ছোট বালক বালিকারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে তবে বড়দের সাহায্য বা উপদেশ নিয়েছে বই কি।

বোম্বাই দেশের একটি এগার বছরের ছেলে এই সভার সভাপতি হয়েছিল। বড়রা যাঁরা ছোটদের উন্নতি কার্য্যে সাহায্য করতে ব্যগ্র, তাঁরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ম্যাঙ্গালোর, ধারওয়ার, কোকাক, কুর্গ, দেভানজেয়ার এবং মহিশূর থেকে এসেছিলেন।

মহিশূরের রাজার বোন এই সভার উদ্বোধন করেন। মহিশূর রাজপরিবারের এক রাজকুমার এই সভায় উপস্থিত থাকাতে সকলের, বিশেষতঃ ছোটদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়েছিল।

বড়রা যাঁরা এই সভার উদ্যোগ করেছিলেন তাঁরা সভাতে কতগুলি প্রস্তাব এনেছিলেন—

নিখিল কার্ণাটিক বালক বালিকাদের সমিতির অধিবেশন প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির সময় হবে।

বিখ্যাত লেখক কর্ত্তৃক লিখিত ছোটদের জন্য বই ছাপানো হবে। কার্ণাটিক প্রদেশে নানা যায়গায় ছোটদের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করতে চেষ্টা করা হবে।

আর কেন্দ্রস্থল বাঙ্গালোরে একটি বাড়ীতে লাইব্রেরী, শিশুদের বিদ্যালয় (নার্সারি স্কুল) ও খেলিবার যায়গা থাকবে।

কার্ণাটিক প্রদেশের নানা যায়গায় এর শাখা স্থাপন করতে হবে। ছোটদের নিয়ে মাঝে মাঝে বিখ্যাত স্থান দেখাতে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

এ সমিতিটি রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছোটদের যত দূর পারা যায় সর্ব্ববিধ উন্নতিকর ও হিতকর শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করা।

এই সমিতির চারিটি অধিবেশনই বাঙ্গালোরে হয়েছে। প্রায় ১২টি শাখা স্থাপিত হয়েছে আর শাখা সমিতিতে ১০০০ হাজার বালক বালিকা ইহার সভ্য হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ছোটদের জন্য এ সমিতি থেকে ৮খানি বই ছাপান হয়েছে। দু'খানা বই ছোটরাই লিখেছে। প্রতি মাসে সমিতির সভ্যদের নিয়ে আবৃত্তি, গল্প বলা, হাতের লেখা, এমব্রয়ডারি, সঙ্গীত, স্কিপিং, ড্রিল প্রভৃতি খেলাধূলার প্রতিযোগীতা হয়। এইরূপ প্রতিযোগীতায় বাঙ্গালোরে ১৫০০ শত, আর শাখা সমিতি থেকে ১৫০ শত ছেলে মেয়ে ও ৬৮টা স্কুল যোগ দিয়েছিল। যারা এ সমিতির সভ্য নয় তারা এক আনা পয়সা ফি দিয়ে যোগ দিয়েছিল। ৪০০ শত টাকা মূল্যের পুরস্কার ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রতি বছর বিতরিত হয়েছে। আর সর্ব্ব ধর্ম্মের ছেলে মেয়েরাই এই প্রতিযোগীতে যোগ দিয়েছিল ও পুরস্কার পেয়েছিল।

সমিতির ছোট ছোট সভ্যদের তৈরী নানা রকম জিনিষের প্রদর্শনীও হয় এবং উৎকৃষ্ট কাজের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাজ এমন চমৎকার হয়েছিল যে সকলে অবাক হয়েছিলেন।

এই সভার বৈশিষ্ট হচ্ছে যে এক ছোট বালক সভাপতির কাজ করেছিল আর ছোটরা বক্তৃতা দিয়েছিল। তাদের উন্নতি বিষয়ক নানা প্রস্তাব তারা উপস্থিত করেছিল এবং সে সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিল। অতগুলি লোকের সম্মুখে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে ও বক্তৃতা দিতে তারা একটুও ভয় পায় নাই।

ছোটদের কবি-বাসর হয়েছিল তারা কবিতা আবৃত্তি করেছিল ও গল্প বলেছিল—কতগুলি তারা নিজেরাই লিখেছিল। তারপরে আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। এ সব কাজে বড়রা অল্পই সাহায্য করেছিলেন। তারা নিজেরাই প্রায় সব বন্দোবস্ত করেছিল। তবে বড়দের উপদেশ সব বিষয়েই তারা নিয়েছিল।

নিজেরা সব কাজের ভার লওয়াতে তাদের কর্ম্মশক্তিও

রেড়ে গেছে। যে তিনজন বালক এই সভার সভাপতির কাজ করেছিল তারা পড়াশুনায় মধ্যম ছিল। কিন্তু তারপরে তারা চেষ্টা করে পরীক্ষায় খুব ভাল ভাবে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা না লিখে, নিজে থেকেই, অসংখ্য শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতে পারে। তাদের মধ্যে যে সব ক্ষমতা লুক্কায়িত ও ঘুমন্ত ভাবে আছে সেগুলি জাগ্রত হয়ে উঠেছে ও তারা নবশক্তিতে শক্তিশালী হয়েছে।

এই রকম সমিতি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই যদি স্থাপিত হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা নূতন জীবন লাভ করবে।

নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, সৎকার্য্যে উৎসাহশীল, জ্ঞানানুরাগী, চরিত্রবান জাতি গঠিত হবে এই আশা করা যায়।

প্রশ্নের উত্তর

শ্রীবিজয় চন্দ্র কর্ম্মকার, বি-এ, ডি, এড্

তুমি কি শুধাও
কোন কথা কহে
ওই পাখী তরু পরে আসি ?
ওই ছোট পাখী
করে আসি গান
কহে "আমি শুধু ভালবাসি।"
শীতের বাতাসে
থেমে যায় গান
জানি না সে কহে কোন কথা ;
বসন্ত আসিলে
সুখি তরু লতা
করে কোন গান ভুলি ব্যথা ?

কোকিলের প্রাণ
ভরি ওঠে গানে
প্রেমে মাতোয়ারা তার প্রাণ।
হেরি শ্যাম তৃণ
অনন্ত আকাশ
সুখ ভ'রে গাহে কোন গান ?
সে গানের শেষ
নাহি জানে সে
চলেছে গাহি' দিবস ভ'রে।
আমি চাই শুধু
মোর প্রিয় জনও
প্রিয়তম ফিরে চাহিছে মোরে।

বিশ্বস্ত বন্ধু

সুধার বয়স বারো, আর শান্তির বয়স এগারো। দু'জনে এক ক্লাসে পড়ে। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। স্কুলের ছুটির পর বাসের জন্য অপেক্ষা করবার সময় তারা স্কুলের বাগানে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছিল। তাদের হেড মিষ্ট্রেস বলেছেন, যে মেয়ের আর জীবনের কোন বিশেষ সত্য ঘটনা নিয়ে ছোট্ট গল্পটি সব চেয়ে ভাল হবে, সে প্রাইজের উৎসবের সময় একটি রূপার মেডেল পাবে। এই বিষয় নিয়ে তাদের কথাবার্ত্তা হলো।

সুধা বলল, কই ভাই, আমি ত ভেবে পাচ্ছি না আমার জীবনে এমন কি বিশেষ ঘটনা ঘটেছে

যা লিখে আমি পুরস্কার পেতে পারি। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

শান্তি লাফিয়ে উঠে বলল, আমি কিন্তু ভাই এমন সত্য ঘটনা লিখব যা পড়ে হেড মিষ্ট্রেস নিশ্চয়ই আমাকে রূপার মেডেলটা দেবেন।

সুধা বলল, তুমি কি এমন লিখবে?

শান্তি বলল, তা আমি কাহাকেও বলব না। কিন্তু ঠিক দেখো, আমিই প্রাইজটি পাব।

এই রকম অহঙ্কারের কথা শুনে সুধার বড় রাগ হল। সে বলল, ও। তোমার ত দেখছি খুব অহঙ্কার হয়েছে! বাবা!

শান্তি বলল, আমার নিজের ক্ষমতার জন্য অহঙ্কার নয়—সেই গল্পটার জন্যই অমন করে বলছি। গল্পটা যে কি চমৎকার!

বাস এসে গেল। তারা যে যার বাসে উঠে পড়লো। সুধা এমন বিরক্ত হয়েছিল আর শান্তির সঙ্গে কোন কথা বলল না। অন্য দিন রোজ যাবার আগে বিদায় নিত আর বলত কাল আবার দেখা হবে ভাই।

সুধা রাত্রে কাগজ কলম নিয়ে বসল। সে বলল, আমি শান্তির অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করব। দেখি, আমি যদি মেডেলটা পেতে পারি।

সে একটা কিছু ঘটনার কথা মনে করতে চেষ্টা করল—যে বিষয়টা অন্ততঃ সত্য বলে জানে কিন্তু কোন ঘটনাই যেন মনে এল না। মনটা ছিল চঞ্চল, কাজেই স্থির হয়ে বসে চিন্তা করতেই পারছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল কি করে শান্তির দর্প চূর্ণ করবে।

শেষে সে বিরক্ত হয়ে বলল, যাক্, আমার মাথায় কিছুই আসছে না। শান্তি যে মেডেলটা পাবে তা আমি চাই না।

এই নিয়ে সে রোজই শান্তির সঙ্গে একটুতেই ঝগড়া করতে লাগল ছুটির সময়ে দেখা হলে আর ভাল ভাবে কথাবার্ত্তা বলত না। সে শেষে ললিতার সঙ্গে বেড়াত, গল্প করত, খেলা করত। শান্তির সঙ্গই ছেড়ে দিল। শান্তি তবুও বুঝতে পারে নাই যে সুধা তার উপরে এত বিরক্ত। কিন্তু তার সঙ্গে যে মিশছে না তাতে সে মনে মনে দুঃখিত। সে ভাবল—সুধার কি হলো। আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই যে বলে না!

মেয়েরা তাদের রচনা হেড মিষ্ট্রেসের কাছে দিয়ে দিল। এখন সুধা শান্তির সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিয়েছে।

সুধার কথা শুনে অন্য মেয়েরাও শান্তিকে অহঙ্কারী মনে করে তার উপর বিরক্ত হয়েছে।

প্রাইজের দিন এল। তাদের স্কুলের হলটি সুন্দর করে সাজান হয়েছে। হলটি লোকে ভরে গিয়েছে। ক্লাসের প্রাইজ দেওয়া হয়ে গেছে হেড মিষ্ট্রেস বললেন,—আমি মেয়েদের বলেছিলাম, যে খুব সুন্দর করে জীবনের কোন সত্য ঘটনা লিখতে পারবে তাকে একটা রূপার মেডেল দেব। অনেকেই রচনাটা লিখেছে। যে লেখাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়েছে সেটাই আমি পড়ছি। মেয়েটি লিখছে—আমি অনেক দেশ বিদেশে বেড়াই নাই কিম্বা অনেক আশ্চর্য্য জিনিষও দেখি নাই কিন্তু আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা সব চেয়ে আশ্চর্য্য বলে মনে হয়েছে, সেইটি লিখছি।

আমার যখন ৭ বছর বয়স, তখন এ ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি তখন যে খুব ভাল মানুষ, শান্ত শিষ্ট ছিলাম, তা নয়। একদিন আমি আমার পুতুলটিকে ছোট্ট খেলার গাড়ীতে বসিয়ে রেলের লাইন পার হয়ে গিয়েছিলাম। লাইনের ওধারে খেলা করছিলাম। মা আমায় রাস্তা পার হয়ে

লাইনের ধারে যেতেই কতবার বারণ করেছেন কিন্তু শুনি নাই। কাছে একটা গাছের তলায় বসে আমাদের পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে তার পুতুলের ফ্রক সেলাই করছিল। তার সঙ্গে আমার কোনদিন কথাবার্ত্তা বা ভাব হয় নাই। সে হঠাৎ বলে উঠল—শীগগীর এপারে দৌড়ে এস, ট্রেণ আসছে শুনতে পাচ্ছ না?

আমি খেলায় এতই মত্ত ছিলাম যে শব্দ শুনতে পাই নাই। সে বলাতে শুনতে পেলাম। আমি দৌড় দিলাম কিন্তু জুতার ফিতাটা কি করে লাইনে আটকে গেল। জুতাটা টেনেও যেন খুলতে পারছিলাম না। সে তখন দৌড়ে এসে আমার অবস্থা দেখে, কাঁচি নিয়ে এল। তখন ট্রেণ প্রায় বাঁক ঘুরে এসে পড়েছে আর কি! চলন্ত ট্রেণের চাপে মাটি কাঁপছে। আর কি ভীষণ শব্দ। আর দুই মিনিট দেরী হলেই আমার পা কাটাত যেতই, আমিও বাঁচতাম না।

সে কাঁচি দিয়ে কচ্ কচ্ করে জুতার ফিতা কেটে দিল, পা টা লাইন থেকে ছাড়িয়ে দিল। সে আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড় ছিল। কিন্তু তার বুদ্ধি কি প্রখর। তারপরে সে আমায় জাপটে ধরে নিয়ে লাইনের ওপারে গড়িয়ে দিল। আর তখনি বিদ্যুৎ বেগে মেল গাড়ী চলে গেল। নিজের জীবন বিপন্ন করে আর একজনকে বাঁচানো এর চেয়ে বেশী আর মানুষে কি করতে পারে? ইতিহাসে সে সব মহৎ কাহিনী পড়েছি এ কাজও সে রকম মহত্ব ও বীরত্বপূর্ণ।

এই আট বছরের সাহসী বালিকার নামটি সকলেরই জানা উচিত। এর নাম সুধা রায়। সে আমার প্রিয়তমা বন্ধু এবং চিরকাল তার সঙ্গে এ বন্ধুত্ব থাকবে।

স্কুলের মেয়েরা সকলে চীৎকার করে উঠল—আমাদের সুধা!

এমন সময় দর্শকদের মধ্য হতে একজক করতালি দেওয়াতে হল ঘরটি করতালি ধ্বনিতে কাঁপতে লাগল।

আর সুধা লজ্জায় তার মুখখানি দুই হাত দিয়ে ঢেকে রইল। তখন তার মনে হল—সেই বিশেষ দিন থেকেই শান্তিকে সে কত ভালবেসে এসেছে।

শান্তি মেডেলটি পেল। কিন্তু তার গল্পটা শুনে সকলেই সুধার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল।

সব মেয়েরা ও শিক্ষয়িত্রীরা সুধাকে খুব আদর করতে লাগলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী যিনি ওদের পুরস্কার দিচ্ছিলেন তিনি তাঁর গলা হতে মালাটি খুলে সুধার গলায় পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতের গোলাপ ফুলের তোড়াটিও তাকে দিলেন।

সুধা বলতে লাগল—আমি এমন কি করেছি? অন্য কেহ ও-সময়ে উপস্থিত থাকলে, সেও এইরূপই করত। সত্যি, শান্তি যে এমন সুন্দর করে ঘটনাটা বলেছে, এটা তারই মহত্ব। আর আমি এ কদিন ধরে তার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহারই করেছি।

শান্তির গলায় সুন্দর ঝক্‌ঝকে রূপার মেডেলটি ঝুলছে, দেখে সুধার খুবই আনন্দ হল। সে তখন শান্তির গলা ধরে আদর করতে লাগল, কত গল্প করতে লাগল।

এরপরে শান্তিকে সে আরও বেশী ভালবাসতে লাগল।

——

গৌরীর শিক্ষা

গৌরী বলে উঠল—যদি পৃথিবীতে কিছু ঘৃণা করি ত স্বার্থপরতা।

সে তার ঘন কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কপাল থেকে সরিয়ে আবার বলল, যেন কেহ তার সঙ্গে তর্ক করছে—এই গল্পের বইয়ে যে মেয়েটির কথা আছে সে কখন নিজের জেদ ছাড়বে না—কারুর জন্য এতটুকু স্বার্থত্যাগ করবে না। সে মনে করে যে তার মত ভাল আর কেহ নাই। এ রকম স্বার্থপর চরিত্র আমি দেখতে পারি না। বড় কাকা, তুমি কি বল ?

বড় কাকা বাগানে এক ডেক চেয়ারে বসে তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। গৌরী আম গাছ তলায় সব চেয়ে বড় চেয়ারে কুশন মাথায় দিয়ে শুয়ে আরামে গল্পের বই পড়ছিল। বাতাসে তার চুল উড়ছিল, শীতল বাতাস লেগে তার খুব আরাম লাগছিল। মাঝে মাঝে চিনির-সাজ দেওয়া বিস্কুট খাচ্ছিল। সে একখানি কমলা লেবু রঙের সাড়ী পরেছিল। গৌরীকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তার বড় কাকা বললেন—হাঁ, গৌরী স্বার্থ-পরতা বড়ই খারাপ। কাহাকেও স্বার্থপর হতে দেখলে আমরা বড়ই বিরক্ত হই!

গৌরী অসন্তুষ্ট হয়ে বললে—যাও, বড় কাকা এ রকম করে বলছ কেন ? এই কথা বলে বিরক্তিতে তার শুভ্র মসৃণ কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে আবার মনঃস্কর রোমাঞ্চ গল্পের মধ্যে ডুব দিল।

এমন সময় তার বড় কাকীমা ধীরে ধীরে বাগানে এসে একটা চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। তাঁর খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল, এখন ভাল হয়েছেন, তবে খুবই দুর্ব্বল। মুখখানি বিবর্ণ। তিনি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়তেই, তাড়াতাড়ি বড় কাকা তাঁর হাত ধরে তাঁর ডেক চেয়ারটিতে বসালেন। গৌরীর একবার মনেও হল না যে তার নরম কুশনটা বড় কাকীমার মাথার তলায় দেয় আর সে যে বড় আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসেছিল সেটা ছেড়ে দেয়।

বড় কাকা বললেন—গৌরী তোমার কুশনটা কাকীমার মাথার তলায় দাও।

তখন তার হুঁস হল।

এমন সময় তার মা তাকে ডাকলেন—গৌরী, গৌরী, শীগগীর আয়।

গৌরী বলল—কেন ডাকছ, মা ?

মা বললেন—একটা কাজ করতে হবে, আয় শীগ্‌গীর! পাশের বাড়ীর মাসীমার কাছে একটা কাজে যেতে হবে।

গৌরী বলল—কেন, অমলকে পাঠাও না ?

মা যখন জোর করে বললেন, "না, গৌরী তোকে যেতে হবে।" তখন সে চেয়ার ছেড়ে উঠল।

গৌরী বক্ বক্ করতে লাগল—সব সময়েই এই রকম হয়। যখনি বেশ একটা চমৎকার যায়গা পড়ি অমনি আমায় মা কাজের জন্য ডাকে। এমন করে কাহারও মা পড়ায় বাধা দেয় না।

কাকীমা বড় কাকাকে বললেন—গৌরী এদিকে বেশ মেয়ে যদি না স্বার্থপর হত। কি দুঃখের কথা!

বড় কাকা বললেন, সে কিন্তু মনে করে না যে সে স্বার্থপর।

গৌরীর ঠাকুর্দ্দা বাগানে ফুল গাছের তদারক করছিলেন। তিনি সব কথাই শুনেছিলেন। তিনি বললেন—গৌরী দিদিমণি যে একেবারে পুরাপুরি স্বার্থপর তা নয়। সে ত দেখি তার খাবারের ভাগ অন্যকে দেয়। যখন সে খেলা-ধূলা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত তখন তাকে বিরক্ত না করলে সে সকলের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করে, বিরক্ত হয় না, রাগ করে না। আর গল্পটা পড়ে সে যে মন্তব্য করল তা সে সত্যি নিজের মনে থেকেই বলেছিল। অন্য লোকে তার সম্বন্ধে কি ভাবে সেটা একটু তাকে জানান দরকার তা হলে সে তার ত্রুটী সংশোধন করে নেবে।

বড় কাকীমা বললেন—গৌরীর একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। কাকাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—স্বার্থপর হওয়া যে কি খারাপ তাকে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বোঝাতে হবে, কি বল?

বড় কাকা বললেন, ঠিক বলেছ। আমি স্বার্থপর সাজবো।

পরদিন সকালে গৌরী বাগানে এসে দেখে সব চেয়ে আরামদায়ক চেয়ারে তার বড় কাকা বসে একমনে বই পড়ছেন। সে তখন তাঁর কাছে এল, তিনি তার দিকে তাকালেন না। গৌরীর ইচ্ছা ছিল কুশন দিয়ে সাজানো বড় চেয়ারে বসে গল্পের বইটা আরাম করে পড়ে কিন্তু তা হল না।

একটু পরেই বড় কাকীমা ধীরে ধীরে বাগানে এলেন। বড় কাকা তা দেখলেনও না।

গৌরী তখন বলে উঠল—বড় কাকা, কাকীমা এসেছেন।

বড় কাকা বললেন—তুমি রোজ বাগানে আসতে পারছ খুব খুসী হলাম। এই বলেই তিনি আবার বইটা পড়তে লাগলেন। আর কাকীমা একটা ছোট চেয়ারে বসে বড়লেন।

বড় কাকা কাকীমার যত্ন নিচ্ছেন না দেখে গৌরী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। শেষে না থাকতে পেরে বলল—বড় কাকা, কুশন দেওয়া বড় ডেক চেয়ারটায় কাকীমাকে বসতে দেওয়া উচিত।

বড় কাকা বললেন—ও! তাই নাকি? তাত মনে হয় নাই, না?" তারপরে হাই তুলে আস্তে আস্তে উঠে কাকীমাকে তাঁর চেয়ারে বসালেন। আর বললেন—আমি জানি না কেন সব সময়ে আমায় লোকে বিরক্ত করে। তিনি বাড়ীর দিকে চললেন।

গৌরী বলল, আজ বড় কাকার কি হয়েছে? বড় কাকা এত ভাল, সকলের সঙ্গে ব্যবহার কি চমৎকার, এত স্নেহশীল! আজ এমন করছেন কেন? অসুখ হয়েছে কি?

গৌরীর ভাই অমল গম্ভীর হয়ে বলল,—ম্যালেরিয়ায় ধরেছে বোধ হয়।

কাকীমা বললেন—তাই ত, তোমার বড় কাকা যেন আজ কারুর দিকেই তাকাচ্ছেন না?

এমন সময় ঠাকুর্দ্দা গৌরীর বড় কাকাকে ডাকলেন—সুরেন।

বড় কাকা বললেন—কি বলছ।

ঠাকুর্দ্দা বললেন—তুমি যদি পোষ্ট আফিসের দিকে যাও ত অমর বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে এই কথাটা বলবে?

বড় কাকা বললেন—পোষ্ট আফিসই ত কত দূর আবার অমর বাবুর বাড়ী ত আরও আধ মাইলের পথ—রমেনকে পাঠাবে কি?

গৌরী যেমন করে তার মার কথার উত্তর দিয়েছিল, বড় কাকাও ঠিক সেই রকম ভাবে উত্তর দিলেন।

গৌরী তা বুঝতে পারল ও লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

ঠাকুর্দ্দা একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন, তবে যাক্।

এখন বড় কাকা বললেন—না, না আমি যাব অখন। তারপরে ধীরে ধীরে বললেন—শুধু গৌরী শুনতে পেল—সকালটা কি ভাবে কাটাব ঠিকঠাক করে বসেছি কি, অমনি নানা লোকে এসে নান. কাজের ফরমাস দেবে যা অন্য লোকে অনায়াসেই করতে পারে। এমন দিন কবে হবে, যেদিন কেউ বিরক্ত করবে না।

গৌরী বলে বঠল—বড় কাকা, তুমি কি বলছ? আমি ত কখনও তোমার মত কথা বলি না। এমন স্বার্থপরের মত!

বড় কাকা বললেন—কে বললে তুই এমন কথা বলিস? তোর নামও ত আমি করি নাই।

গৌরী চুপ করে রইল আর ভাবতে লাগলো। রাত্রে গৌরীদের-বাড়ীতে তার বাবার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁরা বেশী রাত্রে খাবেন না, সন্ধ্যায় খাবেন। কে তাদের পরিবেশন করবে? বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হলেই গৌরীর দাদা বিমল পরিবেশন করে। আজ তাদের স্কুলে একটা সভা হবে সেজন্য তার আসতে রাত্রি হবে। তার মা ভাবলেন গৌরীকে পরিবেশন করতে বলা হবে। গৌরী সেই প্রস্তাব শুনেই আরম্ভ করল—মা, সব কাজই বুঝি আমাকে করতে হবে, না—এ বড় অন্যায়—

বড় কাকা এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেদিকে চোখ পড়াতে সে থেমে গেল।

এর এক সপ্তাহ পরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার গলা জড়িয়ে সে বলল—মা, আমার দোষ আমি বুঝতে পেরেছি। অন্য লোকে যখন স্বার্থপর হয় তখন কেমন খারাপ লাগে। সত্যি, মা আমি আগে এতটা ভেবে দেখি নাই। সেই গল্পের বইয়ের মেয়েটির মত আমিও যে স্বার্থপর তা বুঝ নাই। কিন্তু যখন বড় কাকা ওই রকম ব্যবহার করলেন তখন সব বুঝলাম।

মাকে সব কথা না বলে সে থাকতে পারে না।

প্রকৃত বীর

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা—ইংরাজ কাপ্তেন হেনরী এই কাহিনীটি বলেছেন—

মরিস দ্বীপে আমরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছি, শত্রুদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করছি, যুদ্ধ করছি, গোলা গুলির বর্ষণের মধ্যে প্রাণ ধরে রয়েছি। সৈন্যরা সকলেই সহিষ্ণু ও সাহসী। সকলের মনের বল যেন তাদের দেশের পাথরের মত কঠিন। এই দলের একটি ছেলের কথা বললেই তোমরা বুঝতে পারবে।

১৯ বছরের ছেলে যুদ্ধে আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে আনা হলো। ডাক্তার বললেন অপারেশন করতে হবে। অপারেশন করবার আগে তাকে একটু সবল করবার জন্য ওষুধ হিসাবে একটা গ্লাসে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে তাকে খেতে দিলেন কিন্তু সে কিছুতেই খেলো না।

ডাক্তার আমাকে বললেন—ওর শরীর থেকে অনেক রক্ত পড়ে গেছে, বড় দুর্ব্বল হয়েছে, যদি সে ব্র্যাণ্ডিটুকু না খায় তবে অপারেশনের পর

যদি না বাঁচে তার জন্য আমি দায়ী হতে পারব না।

ছেলেটি বলল—কাপ্তেন সাহেব, আপনি আর যা বলেন তা করতে পারি কিন্তু এ কাজটি করতে পারব না।

কাপ্তেন বললেন—ফ্রাঙ্ক, তুমি ত কখনো আমার অবাধ্য হও নাই। আমি তোমায় আদেশ করছি, এটা খাও।

সে আমার দিকে দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনি যখন কামানের মুখে যেতে বলবেন, আমি তা পারবো। কিন্তু এ কাজটা আমি করতে পারব না।

তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে আমার বড় কষ্ট হলো যে এ দুর্ব্বল শরীরে কি করে অপারেশন সহ্য করবে যদি না কোন বলকারক জিনিষ খায়। আমার চোখে জল এলো। ছেলেটিকে বড় ভালবাসতাম।

আমি তখন অতি দুঃখের সঙ্গে বললাম—তুমি কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ? তোমার জীবন রক্ষা হবে কি করে? তোমার মার জন্য অন্ততঃ এটা ওষুধ হিসাবে খাও।

বালকটি উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো আর তারও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো—সে বল্‌ল কাপ্তেন সাহেব, আমার মার জন্যই আমি ব্র্যাণ্ডি স্পর্শ করব না। আমার বাবা অতিরিক্ত মদ রাওয়াতে মারা যান। আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কখন মদ স্পর্শ করব না। যার জন্য আমার মা বিধবা হয়ে কত কষ্ট পাচ্ছেন আর আমি অনাথ হয়েছি। যদি আমি মরে যাই আপনি অনুগ্রহ করে আমার মাকে জানাবেন যে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি।

এই ঘটনা শুনে কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করা হলো—ছেলেটি কি মারা গিয়েছিল?

কাপ্তেন বললেন—"না, সে ঈশ্বর কৃপায় সেরে উঠলো।

নর ও বানর

শ্রীবেলা দত্ত

পণ্ডিতবর ডারউইন এক শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে মানুষ বানরের বংশধর। এই মতটি এক্ষণে প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা আধুনিক বানরের ন্যায় গাছের উপর দিয়া চারি পা দিয়া চলিয়া যাইত, ডাল হইতে ডালে লাফাইত, ডাল হইতে লেজের সাহায্যে ঝুলিত। বানরেরা জীবনের অধিকাংশ সময় গাছেই কাটাইত বলিয়া ইহারা ভূচর প্রাণী হইতে কতকগুলি ভিন্ন গুণের অধিকারী—অপর জন্তুদের মত ইহাদের গতি এক ভাবে নয়, অবস্থা ভেদে ইহারা নানা ভঙ্গিতে নড়িতে চড়িতে পারে, গাছে ঝুলিবার বা লাফাইবার জন্য ইহাদের হাত পা (ডাল আঁকড়াইয়া ধরিবার পক্ষে) বিশেষ উপযোগী, দূরত্ব নির্ণয়বোধে ইহাদের চক্ষু তীক্ষ্ণ সুতরাং ইহাদিগের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, ভূচর প্রাণীদের কিন্তু দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা ঘ্রাণশক্তিই অধিক প্রবল।

মানুষের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর বানরের চক্ষুপটে একটি পীত রঙের চিহ্ন আছে। এই দাগটি সুস্পষ্ট ও স্থির দৃষ্টির সহায়তা করে। স্থির দৃষ্টি আবার চিত্তকে একাগ্র করে, চিত্তের একাগ্রতা মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতির সহায়তা করে। কতক এই কারণে বটে আর কতক হাত দিয়া সব জিনিস নাড়াচাড়া অভ্যাস আছে বলিয়া বানরেরা অন্য জন্তু অপেক্ষা অধিক চতুর বা মস্তিষ্কশালী হয়।

হাত পা ও মাথা চালানর ফলে বানরের মধ্যে একদল বিশেষ উন্নতি লাভ করিল। তাহারা আকারে বড়

হইতে লাগিল, তাহাদের লেজ ক্রমশঃ লোপ পাইল, তাহারা আগেকার অপেক্ষা গাছে চলাফেরা কমাইয়া দিয়া জমির উপরই বেশী বেড়াইতে লাগিল, তবে আবশ্যক হইলে গাছের ডাল হাত দিয়া ধরিয়া ঝুলিত। ফলে তাহারা চারি পায়ের ভরে না চলিয়া সোজা হইয়া দুই পায়ে চলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের মেরুদণ্ডও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে আরম্ভ হইল।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে এই বানরের দল গাছ ছাড়িল কেন? উত্তরে হয়ত কেহ কেহ বলিবে তাহাদের গুরুভারের জন্য। কিন্তু এই উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেখা যায় যে বৃদ্ধ গুরুকায় পুং বনমানুষ ব্যতীত অপর সকল বনমানুষেরা দেহ ভার সত্ত্বেও যখন তখন গাছে উঠে আবার যে বানরের দল মানুষে পরিণত হইল তাহারা আদৌ গুরুকায় ছিল না—ইহা আধুনিক মানুষের পায়ের গঠন হইতে বুঝা যায়। তাহা হইলে গাছ ছাড়িবার আর কি গূঢ় কারণ থাকিতে পারে?

একদল বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তুষার যুগ আসিবার পূর্ব্বে তাপ কমিয়া যাওয়াতে বৃক্ষাদি লোপ পাইয়া পৃথিবীর নানা স্থল জঙ্গলশূণ্য হইয়া গেল। বনজন্তুরা সেই সেই স্থান ছাড়িয়া অপরাপর জঙ্গলে চলিয়া গেল। যেখানে পর্ব্বতশ্রেণী বা সেইরূপ অন্য কোন ব্যবধান বশতঃ অপর জঙ্গলে পলাইতে পারিল না সেখানে তাহাদিগকে অবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে নিজেদের জীবনবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিতে হইল। যাহারা পারিল না তাহারা বিনষ্ট হইল। যাহারা পারিল তাহাদের মধ্যে ছিল একদল বানর তাহারা ক্রমশঃ মানুষ হইয়া উঠিল।

হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর অঞ্চলবাসী একদল বানর হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণে না আসিতে পারাতে বাধ্য হইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া মানুষে পরিণত হইল। এই মতটি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন মধ্য এসিয়াই—হিমালয়ের উত্তরে হউক বা ককেসিয়াস্ পর্ব্বতের উত্তরেই হউক—মানবের আদি বাসস্থান।

বানর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। এই মতটি নিশ্চয়ই আমাদের আত্ম গরিমাকে আঘাত করে কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ইহা না হইলে আমাদের গঠন ভিন্ন প্রকার হইত হয়ত। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না, যে চরিত্র বলে আমরা মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছি সে চরিত্র পাইতাম না, যে বুদ্ধিবলে আমরা প্রাণী জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছি সে বুদ্ধিও পাইতাম না। সেইজন্য বানরদিগকে নমস্কার!

দুই একজন বৈজ্ঞানিক এই মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলেন যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বৃক্ষারোহী বানর না হইয়া সেই প্রকারের কোন ভূচর জন্তু হইতে পারে। গাছের সহিত তাহাদের সংস্রব অতি অল্পই ছিল ও তাহাদের উন্নতি জঙ্গল বৃদ্ধি বা লোপের উপর নির্ভর করে নাই। এই যদি সত্য হয় তাহা হইলে মানুষের আদিম বাসস্থান আফ্রিকা বা পৃথিবীর অপর কোন অংশে হইতে পারে। আগেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত মতটাই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদিগের মত। তাহা হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে কোথায় আদিম মানবের বাস তাহা অদ্যাবধি নিঃশংসয়রূপে নির্ণিত হয় নাই।

সন্ধ্যা

শ্রীফকীরচন্দ্র সুকুল

নেমে আসে ধীরে সন্ধ্যা,
সোনালী রঙীন বেশ;
ব'হে যায় মৃদু মন্দা
সমীর ভরা আবেশ।

ঘোম্‌টা খুলিতে সন্ধ্যা
শিহরণ লাগে গায়,
ফুটিল রজনী-গন্ধা
কানন বিথীকায়।

কোথা হ'তে এলে সন্ধ্যা
কোন্ সে সুদূর দেশ ?
প্রাণে এনে দাও তন্দ্রা
আনো স্বপনের রেশ।
কোন্ সে কবি গো সন্ধ্যা
যেদিল রূপের রাশি ;
সুললিত নব ছন্দা
কোথা পেলে এত হাসি ?
স্নিগ্ধ-শীতল সন্ধ্যা
সাথে চাঁদিমার আলো,
তুমি যে গো সদানন্দা
তাই লাগে মোর ভালো।

অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা

শ্রীসুবিমল রায়

১। যুক্তপ্রদেশের উত্তরভাগে হিমালয় পাহাড়ে আলমোরা নামে স্বাস্থ্যকর যায়গা আছে। আলমোরা থেকে প্রায় ৯ মাইল দূরে একটি গুহা আছে। পাহাড়ী লোকেরা সেই গুহাকে বড়ই ভয় করিত। এই গুহায় বহুকাল আগে একটি লোক ঢুকিয়াই অজ্ঞান হইয়া যায়, বোধ হয় মরিয়াও গিয়াছিল। বড় বড় সাপকে এই গুহায় ঢুকিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু বাহিরে আসিতে দেখা যায় নাই। একবার প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ এই গুহায় ঢুকিয়াছিল, কিন্তু আর বাহিরে আসে নাই। এই সব কারণে পাহাড়ী লোকেরা এই গুহাকে ভয় করিত। অনেক তীর্থযাত্রী এই গুহা দেখিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে যাইতে সাহস পাইত না। কেহ বলিত সেখানে ভূত আছে, আবার কেহ কেহ ভাবিত সেখানে কোনও দেবতা আছেন। শেষে স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী এই গুহার ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। এই স্বামী জ্ঞানানন্দ এক সময়ে চেকো-স্লোভাকিয়ায় ছিলেন, সেখানে এক কলেজের প্রফেসার ছিলেন। পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। প্রায় চার বছর হইল তিনি এই গুহার রহস্য পরীক্ষা করিয়া সেই বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে গুহায় ঢুকিতে মানা করিয়াছিল। তিনি সাহস করিয়া ঢুকিলেন আর ভিতর হইতে সকলকে বলিলেন, "এই দেখ, আমার কিছুই বিপদ হয় নাই।" লোকেরা বলিল, "আপনি সন্ন্যাসী বলিয়া, ঐ গুহায় যিনি থাকেন তিনি আপনাকে কিছু করিতে পারেন নাই।" জ্ঞানানন্দ গুহার ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, গুহার নানা যায়গায় ছোট ছোট গর্ত্ত আর ফাটল রহিয়াছে। গর্ত্ত আর ফাটলের ধারে ধারে গন্ধক জাতীয় জিনিষ; অন্যান্য উপধাতুও রহিয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে, বর্ষাকালে গুহায় জল ঢোকে, আর পরে যখন জল শুকাইতে আরম্ভ করে তখন নানারকম বিষাক্ত বাষ্প বাহির হয়। তাহাতেই জন্তু, পাখী আর মানুষ সেই গুহায় ঢুকিলে অজ্ঞান হইয়া যায়, পরে মরিয়া যায়। কিন্তু বেশীদিন এই বিষাক্ত বাষ্প থাকে না; অল্পে অল্পে কমিয়া যায়। শেষে বছরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর বিষাক্ত বাষ্প থাকে না। জ্ঞানানন্দ যখন ঢুকিয়াছিলেন, তখন সেখানের বাতাসে আর বিষ ছিল না; তাই তাঁর অনিষ্ট হয় নি। তিনি সেই গুহায় অনেক সাপের হাড় দেখিতে পাইলেন। পাখীর কঙ্কাল আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরা মাকড়সাও দেখিলেন। এই সব দেখিয়া তিনি গুহার বাহিরে আসিলেন। পরে তিনি এই গুহার কথা কাগজে লিখিয়াছিলেন।

২। লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটি নির্জ্জন গলিতে সন্ধ্যার পরে সহজে কেহ যাইতে চাহিত না। অনেক পথিক সেই গলিতে রাত্রে যাইবার সময়ে বিষম ভয় পাইয়াছিল। কেহ কেহ থানায় গিয়া পুলিসে খবর দিয়াছিল। পুলিসকে জানাইবার কারণ এই যে, অনেকের টুপী হারাইয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে প্রথমে দুইটি বড় বড় চোখ দেখা যাইত। চক্ষু-জোড়া কাছে আসিলে, কে যেন থাবা মারিয়া টুপী

কাড়িয়া লইয়া পলাইত। থানায় এই ধরণের নালিশ আসিতে থাকিলে, শেষে একজন সাহসী পাহারাওয়ালাকে সেই গলিতে প্রতি রাত্রে পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পাহারাওয়ালার সঙ্গে একটি লণ্ঠন ছিল। গলিটি বরাবর কিছু নির্জ্জন ছিল, তাহার উপর লোকেরা ভয় পাওয়ার পর থেকে সন্ধ্যার পর প্রায় কেহই সেখানে যাইত না। গলির মাঝখানে একটি ওক্ গাছ ছিল। পাহারাওয়ালা মধ্যে মধ্যে হাঁটিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে সেই ওক্ গাছের নীচের বেঞ্চিতে বসিতেছিল। ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন পাহারাওয়ালা ভাবিল যে, লোকেরা মিছামিছি সেখানে ভয় পায়। একবার সে খুব নিশ্চিন্ত মনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে অন্ধকারে দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু দেখা গেল। পাহারাওয়ালা অবাক্ হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুইটি কাছে আসিয়া পড়িতেছে। পাহারাদারের চমক্ ভাঙ্গিবার আগেই তাহার মাথার পাশ দিয়া চক্ষু দুইটি চলিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার টুপী উড়িয়া গেল। ভীত বিস্মিত পাহারাওয়ালা থানায় ফিরিয়া আসিল আর আর সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। পরদিন সকালে পুলিসের একদল লোক সেই গলিতে গিয়া দুই পাশের বাগান আর বাড়ীগুলিতে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ কিছু পাইল না। শেষে একজন পাহারাওয়ালা গলির মাঝখানের সেই ওক্ গাছে কিছু আছে কি না দেখিবার জন্য গাছের উপরে উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাহার চোড়ে পড়িল: গাছের মাথার ডালপালায় কতকগুলি টুপী ঝুলিতেছে আর এক ধারে একটি প্রকাণ্ড প্যাঁচা বসিয়া আছে। পাহারাওয়ালা গাছে উঠিয়া টুপী নামাইল, প্যাঁচা উড়িয়া গেল। চুরির ব্যাপারটা আগাগোড়া ঐ প্যাঁচারই কীর্ত্তি। অন্ধকারে প্রথমে প্যাঁচার জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি দেখা যাইত, আর পরমুহূর্ত্তেই সে কাছে আসিয়া 'ছোঁ' মারিয়া পথিকের টুপী লইয়া পলাইত। সমস্ত টুপী থানায় জমা দেওয়া হইল। যাহারা টুপীর মালিক তাহারা একে একে আসিয়া টুপী ফিরিয়া পাইল। সেই প্যাঁচাও সাবধান হইয়া গেল। আর কাহারও টুপী হারাইত না।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

লিজি

(রোমীয় উপন্যাস—দ্বিতীয় ভাগ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পেত্রোন বলিলেন—প্রভু, ভিনিসিয়াস চিরকালই রণদেবতার শিষ্য কিন্তু সম্প্রতি গৃহ-লক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে লিজিয়ার ক্রীতদাসীটিকে আপনি আমায় দান করিয়াছিলেন, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। ভিনিসিয়াস এখন তাহাকে বিবাহ করিতে একান্ত উৎসুক। দাসী নিজে রাজকন্যা, কাজেই এ বিবাহে কোন প্রকার নিন্দার হেতু নাই। তবুও রাজভক্ত সৈন্য ভিনিসিয়াস নিজের সম্রাটের অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

সম্রাট বলিলেন, "আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? সৈন্যগণের পত্নী-নির্ব্বাচন কি সম্রাটের কাজ?

পেত্রোন কহিলেন, "ভিনিসিয়াস যে আপনাকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করে—তাই আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।"

সম্রাট,—"তা ভাল। এ বিবাহে সম্মতি দিলাম। মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়। সম্রাজ্ঞীর বিশ্বাস যে

এই বালিকাই রাজ-উদ্যানে আমার শিশু কন্যাকে "দৃষ্টি" দিয়াছিল।

পেত্রোন তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি টিগেলিনকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেবতাদের উপর ডাইনীর দৃষ্টি ফলেনা।"

সম্রাট,—"হাঁ সে কথা ঠিক ; এখন তা আমার মনে হয়েছে।"

তখন ভিনিসিয়াসের দিকে মুখ ফিরাইলেন নীরো জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিনিসিয়াস, সত্যই কি তুমি লিজিয়ান রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও ?

ভিনিসিয়াস—হাঁ, প্রভু।

সম্রাট—"ভাল, আমার আদেশে কল্যই তুমি রোমে ফিরে যাও। তোমার হাতে বিবাহ-অঙ্গুরীয় না পরিয়া আমার সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত হইও না।"

পেত্রোন—প্রভু, আমার শত শত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সম্রাট—"পেত্রোন, তোমাকে সুখী দেখিলেই আমি আহ্লাদিত হইব।"

পেত্রোন—"দেব, আরও একটী অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। সম্রাজ্ঞী যে কন্যার প্রতি বিরূপা, ভিনিসিয়াস তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না ; কিন্তু আপনার মুখের একটী কথায় সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইবে। প্রকাশ করুন যে আপনি এই বিবাহের কর্ত্তা।

সম্রাট। "পেত্রোন, তোমাকে কিম্বা ভিনিসিয়াসকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

তখন তাহারা তিনজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সম্রাজ্ঞী পাপিয়া বৈঠকখানায় রাজসভাসদ টুলিয়াসও নারভাসের সঙ্গে আলাপে মগ্ন ছিলেন। নীরো একখানা আসনে উপবেশন করিয়া একজন ভৃত্যের কানে কানে কি বলিলেন। ভৃত্য সত্বরেই একটী সুবর্ণময় বাক্স লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্য হইতে নীরো একগাছি মুক্তার মালা তুলিয়া লইলেন।

পাপিয়া মনে মনে ভাবিলেন মালাগাছি তাহারই হাতে আসিবে। তিনি উচ্চৈস্বরে বলিলেন,"আহা এ যে উষার আলোকের মত উজ্জ্বল।"

নীরো যেন গল্পচ্ছলে মালাগাছি ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভিনিসিয়াস, এই তোমার বিবাহের উপহার। যাও, আমার আদেশে লিজিয়ার রাজ কুমারীকে বিবাহ কর গিয়ে। আর রাজকুমারীর গলায় এই মালাগাছি পরাইয়া দিও।"

ক্রোধে ও ঘৃণায় পাপিয়ার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি প্রথমতঃ ভিনিসিয়াসের দিকে চাহিলেন, পরে পেত্রোনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পেত্রোন যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এইরূপ ভাণ করিলেন। মালাগাছি হাতে লইয়া তিনি উহার একটী মুক্তা বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ গৃহের বহির্ভাগে ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি উঠিল। নীরোর ভৃত্য জনৈক রাজকর্ম্মচারীর সহিত বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিল, "রোমে আগুণ লাগিয়াছে। সহরের চারিদিকে আগুণ জ্বলিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল সকলেরই মুখ বিবর্ণ।

তখন নীরো উৎসাহপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"ন্যায়বান দেবতা জ্বলন্ত সহর দেখিতে আমায় অনুমতি দিলেন। আমার রচিত 'ট্রয়ের অগ্নি কাণ্ড' এক শ্রেষ্ঠ কাব্য হইবে।" পরে রাজপ্রতিনিধির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শীঘ্র যাত্রার

আয়োজন কর। আমি যেন পঁহুছিয়া জ্বলন্ত রোমনগর দেখিতে পাই।"

রাজকর্ম্মচারী বলিল, "প্রভু, রোম ধ্বংস হইল, নগর অগ্নি-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। নগরবাসিগণ উন্মত্তপ্রায়। যাহারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরে নাই তাহারা ছুটিয়া আগুণে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। প্রভু, রোমের বিনাশ হইল।"

তখন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ভিনিসিয়াস বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য!" আর অমনি পাত্রাবরণ ছুড়িয়া ফেলিয়া সে দৌড়িয়া ভিলার বাহিরে গেল।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

শেষভাগ পরে প্রকাশিত হইবে।

মুকুল সাহিত্য সঙ্ঘ

জুতা পরিহিত বিড়াল

শ্রীসুভাষ লাহিড়ী

একজন মিলওয়ালার একটি মিল, একটা গাধা এবং একটি বিড়াল ছিল।

মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার তিন ছেলেকে এই সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বড় ছেলেকে মিল, মেজ ছেলেকে গাধা এবং ছোট ছেলেকে বিড়াল দিয়াছিলেন।

কিন্তু ছোট ছেলে এই অংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমার ভাইরা সুখে থাকবে, একজন শস্য পেষণ করবে এবং অপরজন তাহা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাজারে বিক্রী করতে পারবে। কিন্তু আমি এবং আমার বিড়াল, মিলের ইঁদুর বধ এবং ঘর পরিষ্কার ছাড়া আর কিছু কর্‌তে পার্‌ব না এবং এই দিয়ে আমি কোন সম্পত্তি কর্‌তে পারব না।

বিড়াল তাহার প্রভুর এইরূপ বিলাপ শুনিয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, প্রভু! মনকে ছোট কর্‌বেন না। আপনি আমার জন্য এক একজোড়া বুট জুতা এবং একটি থলি কিনুন। আমি আপনার ভাইদের চাইতে ভাগ্য ভাল করে দেব।

সুতরাং যুবক তাহার শেষ পাউণ্ড খরচ করিয়া বিড়ালের জন্য একজোড়া সুন্দর বুট জুতা এবং একটি থলি কিনিয়া আনিলেন।

বিড়াল বুট জুতা পরিয়া কাঁধে থলি ঝুলাইয়া খরগোস রাখা বাগানে প্রবেশ করিল। সে থলিতে কিছু ভূঁষি এবং কাঠের গুঁড়া ভরিয়া রাখিয়াছিল। বাগানের এক জায়গায় সে থলিটির মুখ খুলিয়া মাটির উপর রাখিয়া দিয়া তাহার সহিত একটি দড়ি বাঁধিয়া একটি ঝোপের ভিতর লুকাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে একটি খরগোস আসিয়া ভূষি এবং কাঠের গুঁড়া খাইতে থলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ বিড়াল দড়ি ধরিয়া টান দিল এবং খরগোস ধরা পড়িল এবং নিহত হইল।

শুভভাগ্য দেখিয়া বিড়াল খুব আনন্দিত হইল এবং তখন রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল।

যখন তাহাকে রাজসিংহাসনের নিকট লইয়া যাওয়া হইল তখন সে নত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিল এবং বলিল, "যে সম্রাট! আমার

প্রভু কোরাবাসের মার্কুইস্" আপনাকে এই খরগোসটি উপহার দিয়েছেন।

রাজা বলিলেন, তোমার প্রভুকে বোল, তাঁর উপহার পেয়ে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরদিন সে শস্যক্ষেত্রে লুকাইয়া দুইটি বন্য খরগোস ধরিয়া রাজাকে কোরাবাসের মারকুইসের প্রদত্ত উপহার স্বরূপ প্রদান করিল। তারপর হইতে সে প্রত্যহ নানারূপ উপহার রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইত। ইহাতে রাজাও খুব আনন্দিত হইলেন।

একদিন বিড়াল শুনিল, রাজার একমাত্র কন্যা নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তখন সে তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রভু! আমি যা' বলব তা' যদি আপনি করেন তো নিশ্চয়ই আপনার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে। নদীর যে জায়গা আমি দেখিয়ে দেব সেইখানে গিয়ে স্নান করুন এবং জলের মধ্যে আমি আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।

যুবক বিড়ালের উপদেশানুসারে নদীতে স্নান করিতে গেলেন। তিনি যখন জলে নামিলেন তখন বিড়াল তার মলিন পরিচ্ছদটি একটি বড় পাথরের নীচে লুকাইয়া রাখিল।

ঠিক্ সেই সময় রাজার গাড়ী সেখানে আসিয়া পড়িল; বিড়াল তখন দৌড়াইতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার প্রভুকে সাহায্য করুন! আমার প্রভুকে সাহায্য করুন!! আমার প্রভু কোরাবাসের মারকুইস জলে ডুবে যাচ্ছেন।"

রাজা তাহার চীৎকার শুনিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিলেন এবং বিড়ালকে চিনিতে পারিয়া তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিড়াল উত্তর করিল, মহাশয়, আমার মহৎ প্রভু মারকুইস যখন নদীতে স্নান করছিলেন সেই সময় কয়েকজন চোর তাঁহার পোষাক চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। পোষাকের জন্য তিনি বহুক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ভয় হল তিনি হয়ত আক্ষেপ করবেন এবং জলে ডুবে মারা যাবেন।

ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে মারকুইসের সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন এবং অপর কয়েকজন অনুচরকে রাজবাড়ী হইতে খুব সুন্দর এক প্রস্থ পোষাক আনিতে আদেশ করিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সুন্দর, রাজপ্রদত্ত পরিচ্ছদধারী যুবক রাজা এবং রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিবার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই সুবেশধারী যুবককে দেখিয়া রাজকুমারী তাহাকে পছন্দ করিলেন; এবং রাজা তাঁহাকে তাঁহাদের পাশে আসিয়া বসিতে আহ্বান করিলেন।

বিড়াল তাহার নিজের মতলব সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সম্মুখে দৌড়াইতে লাগিল এবং কতকগুলি লোককে কাজ করিতে দেখিয়া বলিল, "হে ভদ্র! যে রাজা এই দিক দিয়ে আসছেন তাঁকে যদি তোমরা এই জমি কোরাবাসের মারকুইসের না বল তবে তোমাদিগকে মাংসের মত টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে দেওয়া হবে।" কৃষকেরা অত্যন্ত ভয় পাইল।

রাজা সেখান দিয়া যাইবার সময় সেই জমি দেখিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জমির মালিক কে?" তাহারা তাড়াতাড়ি বলিল, আমাদের প্রভু কোরাবাসের মারকুইস।

রাজা মিলওয়ালার পুত্রকে বলিলেন, মহাশয়, আপনার এই রাজ্যটিত অতি চমৎকার!

যুবকটি কেবলমাত্র মাথা নত করিলেন এবং লজ্জিত হইলেন কারণ তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে বিড়াল আবার সম্মুখে চলিতে লাগিল এবং সম্মুখে কৃষক, কাঠুরিয়া ইত্যাদি যাহাদিগকে দেখিল তাহাদিগকে বলিল, তোমরা রাজাকে বলবে, তোমরা যে জমিতে কাজ করছ সেই জমি কোরাবাসের মারকুইসের। নিহত হইবার ভয়ে তাহারা সকলে বিড়ালের কথা শুনিল।

রাজাও এই নূতন পরিচিত যুবকের ধনসম্পত্তি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মিলওয়ালার ছেলে কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন কারণ তিনি এই সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না।

অবশেষে বিড়াল একটি জমকাল উচ্চ দুর্গে পৌঁছাইল। সেখানে এক দৈত্য বাস করিত এবং দুর্গের নিকটস্থ দেশটি জয় করিয়া লইয়াছিল। ইহা ছাড়াও সে একজন ওস্তাদ যাদুকর ছিল।

বিড়াল তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিল এবং তাহার অনুমতি পাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি শুনেছি আপনি অত্যন্ত চতুর এবং ইচ্ছা করলে আপনি যে কোন আকৃতি ধরতে পারেন—ইহা কি সত্য?

দৈত্য বলিল, হাঁ, ইহা সত্য। এই বলিয়া সে নিজেকে সিংহে পরিণত করিল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বিড়াল পূর্ব্বেই সাবধান হইয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া জলের নল বাহিয়া উপরে উঠিল যদিও জুতা পরিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

যখন দৈত্য নিজের আকৃতিতে রূপান্তরিত হইল তখন সে সাহস করিয়া আবার নামিয়া আসিল। তারপর বলিল, আপনি অত্যন্ত চতুর কিন্তু স্বভাবতঃ আপনি আপনার মত বড় এবং শক্তিশালী প্রাণীর আকৃতি নিতে পারেন। আপনি বোধ হয় ছোট প্রাণীর দেহ গ্রহণ করতে পারেন না; এই যেমন, ইঁদুর।

দৈত্য বলিল, নিশ্চয় আমি ছোট প্রাণীর রূপও ধরিতে পারি এই বলিয়াই সে একটি ছোট ইঁদুরের রূপ লইয়া মেঝেতে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল।

বিড়াল তাহাকে আবার নিজের রূপ ফিরিয়া পাইবার পূর্ব্বেই খাইয়া ফেলিল ঠিক সেই সময় বিড়াল দুর্গের বাহিরে রাজার ঘোড়ার ডাক এবং বহু লোকজনের আগমনের শব্দ শুনিয়া দুর্গের দরজায় আসিল এবং বলিল, মহারাজ! আসুন, ইহাই কোরাবাসের মারকুইসের দুর্গ। হে মহারাজ! এই সুন্দর দুর্গ আপনাদেরও।

রাজা বলিলেন, নিশ্চয় আমরা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করব। সেই সময় মিলওয়ালার ছেলে রাজকুমারীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। তখন সকলে একসঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে দৈত্যের ভৃত্য পূর্ব্বেই একটি মহা ভোজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া ছিল। সকলে সেই ভোজ খাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মারকুইসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজাও এমন জমকাল দুর্গ দেখিয়া এবং সুন্দর যুবক মারকুইসের বিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে মারকুইস! আমি আপনাকে আমার জামাই হবার জন্য প্রস্তাব করছি।

যুবক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সম্মতি দিল এবং সেইদিনই তাঁহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল

জিজ্ঞাসা

তোমাদের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে পার—দেখ কি উত্তর পাও—

—এক অন্ধের এক ভাই ছিল আর সেই ভাইটি মারা গেল। অন্ধের সঙ্গে সেই ভাইয়ের কি সম্বন্ধ ছিল বলত ?

খুব তাড়াতাড়ি উত্তরটা চেয়ো। দেখবে প্রায় সকলেই বলবে—কেন নিশ্চয়ই সে তার ভাই ছিল।

কিন্তু ঠিক উত্তর হলো—সে তার বোন ছিল। অন্ধটি স্ত্রীলোক ছিল।

মজার অঙ্ক

তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করত—৪৫ থেকে ৪৫ বাদ দিয়েও ৪৫ থাকে কিনা। সে ত এ কথা শুনে অবাক হয়ে যাবে, না ? কেমন করে এটা সম্ভব হতে পারে তাত বলতে পারবে না।

তখন তুমি তাকে সেটা যে সম্ভব তা দেখিয়ে তাকে অবাক করে দেবে।

এখন দেখ কেমন করে এটা সম্ভব হয়—এই সংখ্যাগুলি লিখ—

	৯৮৭৬৫৪৩২১ = ৪৫	(সংখ্যাগুলি
ইহা হতে	১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৪৫	যোগ করে)
বাদ দাও	৮৬৪১৯৭৫৩২ = ৪৫	

এখন বুঝলে ত কেমন করে এমন অদ্ভুত জিনিষ সম্ভব হয় ?

বিচিত্র সংবাদ

কোন ঝোপ বা ঝাড়ের নীচে যেখানে রদ্দুর যেতে পারে না সেখানে বর্ষার জলে ভিজে যে সমস্ত গাছের পাতা বা তৃণ গুল্মাদি পচে থাকে, তাহা হতে রাত্রিকালে এক রকম আলো বার হয়। দূর থেকে ঐ আলো লোকে দেখতে পায়।

—•—

১১৮০ খৃষ্টাব্দে সব প্রথমে ইংলণ্ডে কাচের জানালা ব্যবহৃত হয়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সব প্রথম রেশমের মোজা ব্যবহার করেন। ১৬[illegible]৬ খৃষ্টাব্দে সব প্রথম ইংলণ্ডবাসীরা চা পান করেন।

—•—

পৃথিবীর গতির বেগ ১০০ বছরে এক মিনিট করে কমে যাচ্ছে। আর গতিরও সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই।

—•—

ধূপ গাছ বলে পৃথক গাছ আছে। গাছ বড় হলে তাহা হতে জিয়লের আটার মত এক রকম কষ বার হয়। তাহা প্রচুর পরিমাণে মাটিতে পড়ে থাকে, তাহা সংগৃহীত ধূপ বলে বিক্রী হয়। ত্রিপুরা ও আসাম পাহাড়ে ইহা জন্মে।

বলত ?

১। সাতটা প্রধান সমুদ্রের নাম করত ?

২। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টে কোন্ মহিলা সর্ব্ব প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন ?

৩। খাঁটি দুধে জলীয় ভাগ কত ?

৪। কে সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করেন ?

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। বামন।

২। দুঃখ কষ্ট।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ফাল্গুন মাসের ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—অমলকুমার মিত্র, গৌহাটি।

নিবেদন

যুদ্ধের বিভিষিকার মধ্যে নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ আমরা আপাততঃ মুকুল প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। যুদ্ধের গোলমাল মিটিলে আবার মুকুল প্রকাশিত হইবে।

যাহাদের চাঁদা জমা আছে তাহারা প্রাপ্য ফেরত পাইবেন। আশা করি গ্রাহকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

মুকুল সম্পাদক।

—•—

মুকুল প্রেস—২৯৪, দর্গা রোড, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন?

একবার ব্যবহারে বুঝিতে পারিবেন।

সামার-লিলি
নটেড্ মেস
ফ্যান্সি-নীট
সুপার-ফাইন
কালার-সার্ট
লেডী-ভেষ্ট
কুল্‌টী

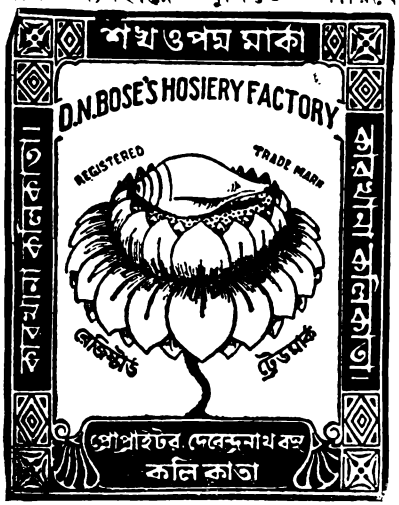

সামার-ব্রীজ
শো-ওয়েল
কুল-ওয়্যার
সামার-নীট
গ্রে-সার্ট
সিল্‌কট
স্যাণ্ডো

সুদীর্ঘকাল ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট—আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন।

কারখানা—৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ৬০৫৬

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

প্রচুর ফেন ঃঃ স্নেহময় স্পর্শ
মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা .. বোম্বাই